ভূমিকা

ছন্দ ও অলংকারের তত্ত্বকথা লইয়া কয়েকখানি পুস্তক বাঙ্‌লায় রচিত হইলেও মহাবিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের উপযোগী এবং সেই সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত বিচার অনুসারে ছন্দ ও অলংকার সম্বন্ধে একখানি আলোচনা-গ্রন্থ রচনার অবকাশ আছে ইহা উপলব্ধি করিয়া এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। বাঙ্‌লার ছাত্রগণ এবং অধ্যাপকবৃন্দ ইহাতে উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তক প্রণয়নে অধ্যাপক ডক্টর্ ক্ষুদিরাম দাস, এম. এ., ডি-লিট্- লিখিত ছন্দ-অলংকার বিষয়ক "বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি" গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বিষয়ে সহায়তা লাভ করিয়াছি।—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ছন্দঃ-প্রকরণ

ছদ্ ধাতু হইতে ছন্দঃ শব্দের উৎপত্তি। মূল অর্থ যাহাই হোক, সুরতালে নিয়মিত সুতরাং পাদবদ্ধ বাক্যের বিশেষ রূপ-ভঙ্গিমাকেই ছন্দ বলে। বেদকে ছন্দঃ বলা হইয়াছে, কারণ বেদের মন্ত্রগুলি ঐপ্রকার সুরতালে আবদ্ধ। উহাতে ঐ বন্ধনেরই বিশেষ বিশেষ রূপ অনুষ্টুভ (শ্লোক), গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্, জগতী ইত্যাদি।

লৌকিক সংস্কৃতে ক্রমশঃ ছন্দের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। প্রথমে বর্ণকে ভিত্তি করিয়া **বর্ণবৃত্ত** (যাহাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণ যতি ও পাদে বদ্ধ করা হয়), পরে প্রাকৃতযুগে সম্ভবতঃ সংগীতের আবির্ভাব ও প্রভাবের ফলে **মাত্রাবৃত্ত** (বর্ণসংখ্যা যাহাই হোক না কেন নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যা যাহার পাদগঠনের ভিত্তি)।

ছন্দঃ শব্দটিকে খুব সাধারণভাবে দেখা যাইতে পারে। ইহার মূলতত্ত্ব হইল বিশেষ একটি নিয়ম। নিয়মের মধ্যেই আনন্দ, বন্ধনের মধ্যেই সৌন্দর্য। সৃষ্টিতেও নিয়মের মধ্যে লীলার সৌন্দর্য। ইহা লক্ষ্য করিয়াই কবি বলিয়াছেন—"ছন্দে উঠিছে তারকা, ছন্দে কনক-রবি উদিছে।' মানবোচ্চারিত বাক্য নিয়মহীন। উহা বিশিষ্ট সংখ্যক অক্ষরযুক্ত পাদে আবদ্ধ নহে। রামায়ণে গ্রথিত কাহিনা অনুসারে মহর্ষি বাল্মীকির মুখ হইতে যখন অনায়াসে "শ্লোক" ছন্দ নির্গত হয় তখন তিনি এই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, উহা সাধারণ বাক্যের মত নহে, উহা নির্দিষ্ট অক্ষর-সীমায় আবদ্ধ, পাদযুক্ত। নিয়মের মধ্যবর্তী আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে বলিতেছেন,

তটের বন্ধনে আবদ্ধ নদীর চঞ্চলগতি ছন্দোময়, বিলের বিস্তৃত জলরাশি ঐরূপ তটসীমায় আবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, উহা ছন্দোহীন বোবা। (ছিন্নপত্রাবলী)

নানা প্রকারের পাদবিন্যাস ও চরণ-বিভাগের দ্বারা বহুধা বিচিত্র আধুনিক বাঙ্‌লা ছন্দের রূপসমূহের সূক্ষ্ম বিভাগ নির্ধারণ ও নামকরণ আজও হয় নাই। পূর্বে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিবিধ বিন্যাস অনুসারে কয়েকটি নাম দেওয়া হইয়াছিল, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, মালতী, মালঝাঁপ, একাবলী, দিগক্ষরা বৃত্তি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর মিলবিন্যাস, চরণক্ষেপ ও স্তবক নির্মাণে যে সকল রূপবৈচিত্র্য আসিয়াছে তাহার ঠিক ঠিক বিভাগ করিয়া নামের প্রবর্তন করিলে কাব্য পাঠকদের রসবোধের সহায়তা হয়।

বাঙ্‌লার ছন্দোরীতি তিন প্রকার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। বাঙ্‌লা ছন্দ সংস্কৃত হইতে আসে নাই, সংস্কৃতের সহিত উহার প্রত্যক্ষ কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃত-অপভ্রংশের সহিত আছে। অপভ্রংশের পর যেমন (বাঙ্‌লা) ভাষা, অপভ্রংশ হইতে তেমনি (বাঙ্‌লা) ছন্দ। বাঙ্‌লা 'অক্ষরবৃত্ত' অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত হইলেও উচ্চারণরীতিতে পৃথক্ পথ ধরিয়াছে। বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত অপভ্রংশের মাত্রাবৃত্তের প্রায় যথাযথ অনুসরণ। এই দুইটি ছন্দ বিষয়ে যাঁহারা গভীর জ্ঞান অর্জন করিতে চান তাহাদের অপভ্রংশ ছন্দোরীতি সম্বন্ধে অবহিত হইতেই হইবে। ইহা ব্যতীত আর একটি বিশেষ উচ্চারণ-রীতির ছন্দ আমাদের মধ্যে কোলজাতি-সংস্পর্শ হইতে আসিয়াছে। উহা ঝোঁক-সর্বস্ব শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। শ্বাসের দ্বারা ইহার মাত্রা ও যতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ের

স্বরূপ অবগত হওয়ার পূর্বে ছন্দের মূলীভূত কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে পরিষ্কার বোধের প্রয়োজন।

অক্ষর, ছেদ, যতি, মাত্রা ও পর্ব

অক্ষর—ইহার ইংরাজী নাম syllable। স্বল্পতম বা একটিমাত্র প্রয়াসে আমরা যে ধ্বনিটুকু উচ্চারণ করি। যেমন অ, উ, ঐ, ক, শ, অন্, রক্, সন্, জল্ ইত্যাদি। হরফের সঙ্গে অক্ষরের গোলযোগ যেন না হয়। হরফ্ (কেহ কেহ 'বর্ণ'ও বলিয়া থাকেন, যদিও বর্ণ বলিতে রূপযুক্ত উচ্চারিত ধ্বনিকেই বুঝায়) বলিতে বর্ণবিশেষের লিখনরীতি বুঝায়। ইহা লেখায় রূপ দেওয়ার একটা প্রকার মাত্র। উচ্চারণের সঙ্গে উহার কোনও যোগ নাই। 'অক্ষর' শব্দের ভুল প্রয়োগ করিয়া আমরা বলি "অক্ষর পরিচয়"। ইংরাজী "strong" শব্দে উচ্চারিত অক্ষর (syllable) একটি মাত্র, কিন্তু হরফ কয়টি? তেমনি স্রষ্‌টা (স্রষ্টা) ইহাতে অক্ষর দুইটি, প্রথম অক্ষরকে লিখনের দ্বারা জানাইতে তিনটি হরফ লাগিয়াছে।

উচ্চারিত একটি ধ্বনি বা বর্ণে একটি অক্ষর হইতে পারে আবার দুইটি ধ্বনি বা বর্ণেও একটি অক্ষর হইতে পারে। অবশ্য ব্যঞ্জন-বর্ণের ক্ষেত্রে স্বরের সঙ্গে যোগ না থাকিলে উহার রূপ পরিস্ফুট হয় না। সেজন্য ব্যঞ্জনগ্রথিত অক্ষর স্বরধ্বনি সংযুক্ত হইবেই। ঐরূপ স্বর বা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন একটির উচ্চারণে **মৌলিক অক্ষর**, আর দুইটির একত্র উচ্চারণে **যৌগিক অক্ষর**। **অ, এ, উ, ঊ, ও, কা, কি, কে** প্রভৃতি মৌলিক। **ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ) আই, আউ, দৈ, নাই, তিন্, টক্, দেন্, জল্, মান্** প্রভৃতি যৌগিক। যৌগিকের

মধ্যে যেগুলি স্বরযুক্ত সেগুলি যৌগিক স্বরাক্ষর, আর যেগুলি হসন্ত ব্যঞ্জনযুক্ত যৌগিক সেগুলি যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

ছেদ—ভাবের বা বাক্যার্থের সমাপ্তি জনিত বিরামকে 'ছেদ' বলা হয়। উহা বর্তমানে দাঁড়িচিহ্ন, সেমিকোলন, কমা প্রভৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। ভাবের অর্ধ সমাপ্তিতে অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণসমাপ্তিতে পূর্ণচ্ছেদ। পূর্ণচ্ছেদের ক্ষেত্রে শ্বাস-বিরতিও ঘটে, সমস্ত বাগ্‌যন্ত্রই ইহাতে বিশ্রাম পায়।

যতি ও পর্ব—ভাবসমাপ্তি না ঘটিলেও শ্বাস বা ঝোঁকের প্রয়োজনে বিহিত অত্যাবশ্যক বিরাম। সংস্কৃতে 'যতি'কে বলা হইয়াছে—জিহ্বেষ্ট বিরামস্থল। কিন্তু এরূপ বর্ণনায় যতির স্বরূপ বোঝা যায় না। বাঙ্‌লা বাক্যের উচ্চারণে আমরা এক এক ঝোঁকে এক একটি শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করি। আমাদের উচ্চারণে যদিও পৃথক্‌ভাবে প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষরে যতি থাকে, বাক্য-উচ্চারণের বেলায় ঐ প্রতিটি শব্দের স্বাধীন যতি শব্দগুচ্ছ-যতির নিকট আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে এক একটি বাক্য কয়েকটি শ্বাসবিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই শ্বাসবিভাগগুলিকে **পর্ব** নাম দেওয়া যায়। নিম্নের উদাহরণে একটি বাক্যের শ্বাসবিভাগ অর্থাৎ পর্ব দেখানো হইতেছে—

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী | প্রস্রবণ গিরি।* ইহার
শিখর দেশ | সতত সঞ্চরমাণ | জলধর পটল সংযোগে। নিরন্তর
নিবিড় নীলিমায় | অলংকৃত | * পাদদেশে | প্রসন্নসলিলা
গোদাবরী | তরঙ্গ বিস্তার করিতে করিতে | যাইতেছে।*

এখানে লম্বা দাঁড়ি চিহ্নিত স্থানগুলিতে যতি পড়িতেছে। ভাব সম্পূরণ জনিত ছেদ পড়িতেছে তারকা চিহ্নিত স্থানগুলিতে। দুইটি

লম্বা দাঁড়ির মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ যতি দ্বারা বিভক্ত অংশই **পর্ব**। সুতরাং যতিকে আমরা শ্বাস-বিরতি নামে অভিহিত করিতে পারি। দেখা যায়, শ্বাস-বিরতি বাক্যের অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব একটা অর্থ-বিভাগকে মান্য করিয়া চলে। আমরা এমনভাবে শ্বাসপতন ঘটাই না যাহাতে—পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা। গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার | করিতে করিতে যাইতেছে—এরূপ পাঠ হইয়া পড়ে।

উপরের উদাহরণ অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, ঐ যতি কয়টি অক্ষরের পর পড়িবে সে সম্পর্কে কোনও নিয়ম নাই। কোথাও বারো, কোথাও ছয়, কোথাও নয়, এইরূপ যেখানে সুবিধা সেইখানে পড়িয়াছে। কবিতায় কিন্তু এরূপ নহে। সেখানে যতি চরণের মধ্যে সর্বত্র সমসংখ্যক অক্ষরের উপর না পড়িলেও একটা বিশেষ রূপগত সমতা রক্ষা করে। উহাতেই ছন্দের সামঞ্জস্য বোধের আনন্দ। একটি কবিতার প্রতিটি চরণ ও স্তবকে একই রীতির যতিবিন্যাস দেখা যায়। ছন্দোগত বিশেষ একটি রীতি বা form-এর আনুগত্যই ছন্দোবদ্ধ কবিতার সৌন্দর্যের কারণ। নিচের দৃষ্টান্তগুলিতে যতিবিন্যাসের নানাবিধ রূপ দেখানো হইল। যতি যে কোনো সংখ্যার অক্ষর বা মাত্রার পর পড়ুক না কেন এক একটি কবিতাংশে এক একটি বিশেষ প্যাটার্ন্—

(১) অন্নপূর্ণা উত্তরিলা | গাঙ্গিনীর তীরে। =(৮+৬ অক্ষর
পার কর বলিয়া ডা | কিলা পাটনীরে॥ 'পয়ার' ছন্দ)
সেই ঘাটে খেয়া দেয় | ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা | বামাস্বর শুনি॥

(২) আশ্বিনের মাঝামাঝি | উঠিল বাজনা বাজি |
পূজার সময় এল কাছে | (=৮+৮+১০ অক্ষর
"ত্রিপদী" ছন্দ)

মধু বিধু দুই ভাই | ছুটাছুটি করে তাই |
আনন্দে দুহাত তুলে নাচে |

(৩) ছাড় আই বলা | জানি সকল। (=৬+৫ মাত্রা
গোড়ায় কাটিয়া | আগায় জল ॥ "একাবলী" ছন্দ)
বড়র পিরিতি | বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাঁদ ॥

(৪) সাগর জলে | সিনান করি | সজল এলো | চুলে,
বসিয়াছিলে | উপল উপ | কূলে ।
=(শেষাংশ ছাড়া সর্বত্র ৫ মাত্রার পর যতি।)

(৫) কাক্ কালো | কোকিল কালো | কালো ফিঙের | বেশ।
সবার চেয়ে | কালো কন্যে | তোমার মাথার | কেশ ॥
=(শেষাংশ ছাড়া সর্বত্র ৪ অক্ষরের পর যতি—
শ্বাসমাত্রিক ছন্দ)

ইংরাজি accented ও unaccented অক্ষরের বিশিষ্ট রূপকল্পের মধ্যে যে pause পড়ে উহা বাঙ্‌লা যতির তুল্য। সংস্কৃতে যতির বিধান থাকিলেও উহা সংস্কৃত ছন্দে গৌণ ব্যাপার, মুখ্য বিষয় হইল অক্ষর-সমূহের নির্দিষ্ট হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের বিশেষ রীতিতে বিন্যাস। বাঙ্‌লায় যতির মুখ্যতা। সেইজন্য যতির দ্বারা বিভক্ত পর্বই বাঙ্‌লা ছন্দের ভিত্তিস্বরূপ। যদিও একথা ঠিক কেবল যতিবিভাগই বাঙ্‌লা ছন্দের বৈচিত্র্যের একমাত্র নিয়ামক নহে। এ বিষয় পরে আলোচিত হইতেছে।

মাত্রা—মাত্রা অর্থে কালের নির্দিষ্ট মাপ। বাক্য অথবা শব্দ অথবা অক্ষর উচ্চারণ করিতে আমাদের অল্প বিস্তর সময় লাগে। একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের একটি অক্ষর স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করিতে যেটুকু সময় লাগে তাহার পরিমাণকে একক ধরিয়া এক মাত্রা। দুই অক্ষরে দুই মাত্রা, আট অক্ষরে আট মাত্রা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনবশে কোনও কোনও অক্ষর একটু বেশি টান দিয়াও উচ্চাবণ করিতে হয়। যেমন, যাঃ, তা-ই তো! এরকম টানে এক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। গানের ক্ষেত্রে এরকম টান গাণিতিক ভাবে একমাত্রার ঠিক দ্বিগুণ করিয়া দুই মাত্রা, তিনগুণ করিয়া তিন মাত্রা এইরূপ ধরিতে হয়। কবিতার মাত্রার অতটা গাণিতিক হিসাব নাই। একমাত্রা সময়ের বেশি লাগিলেই মোটামুটি দুই মাত্রা ধরা চলে। আবার গানের ক্ষেত্রে উচ্চারণ বশে একমাত্রার চতুর্গুণ এক-মাত্রার এক চতুর্থাংশ প্রভৃতি উচ্চারণ এবং হিসাব সহজেই করা হইয়া থাকে, কিন্তু কবিতায় প্রচলিত মাত্রাসংখ্যা হইল এক অথবা দুই। এক-মাত্রার অক্ষর **হ্রস্ব** দুইমাত্রার অক্ষর **দীর্ঘ**।

কবিতা ছাড়া অন্যত্র দুই মাত্রার অধিক টান থাকিলে সে অক্ষরের নাম দেওয়া হয় **প্লুত**। "দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।"

হ্রস্বতা
দীর্ঘতা

সংস্কৃতে কোন্ অক্ষর (syllable) এক মাত্রার হইবে কোন্ অক্ষর দুই মাত্রার হইবে এসম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম বর্তমান। হ্রস্বস্বর এবং হ্রস্বস্বর-যুক্ত ব্যঞ্জন সংস্কৃতে একমাত্রা বা হ্রস্ব। আ, ঈ, ঊ, এ প্রভৃতি দীর্ঘস্বর। ঐ স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ও দীর্ঘ। ঐ, ঔ, এই দুইটি দ্বিস্বর

বা দ্বিস্বরযুক্ত ব্যঞ্জন এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (বা যুক্তবর্ণের আগেকার বর্ণটি) গুরু বা দীর্ঘ। ইহা স্থির। বাঙ্‌লায় হ্রস্বতা-দীর্ঘতা সম্বন্ধে ঐরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে এটা ঠিক যে অ, ই, উ যুক্ত ব্যঞ্জনকে সচরাচর কোনক্রমেই দীর্ঘ ধরা চলে না। বাঙ্‌লায় স্বাভাবিক উচ্চারণে সব অক্ষরই হ্রস্ব। কবিতায় প্রয়োজনবশে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ প্রভৃতি স্বর এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দীর্ঘ করিয়া লইতে হয়। উদাহরণ—

(১) মনে পড়ে দুই জনে যুঁই তুলে বাল্যে —রবীন্দ্রনাথ

(নিম্নরেখ অক্ষর দুই মাত্রার)

(২) দুই জনে যুঁ ই তুলতে যখন গেলেম বনের ধার —রবীন্দ্রনাথ

(নিম্নরেখ অক্ষর এক মাত্রার)

(৩) রূপযৌবন উপঢৌকন দেবেন কন্যা তাঁহারে।

(নিম্নরেখ অক্ষর দুই মাত্রার)

(৪) যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা (একমাত্রার)

(৫) আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি

(নিম্নরেখ অক্ষর দুই মাত্রার)

বাঙ্‌লা ছন্দে মাত্রাস্থাপনের সাধারণ নিয়ম

উচ্চারণের পার্থক্য হিসাবে বাঙ্‌লায় তিন রীতির ছন্দ আছে—(এ বিষয়টি পরে ব্যাখ্যাত হইতেছে)। এই তিনটির মধ্যে মাত্রা-স্থাপন বিষয়ে সর্বত্র ঐক্য নাই। মাত্রাস্থাপন বিষয়ে ইহাদের

পার্থক্য উচ্চারণরীতিগত। যদিও বাঙ্লা ছন্দে অক্ষরের হ্রস্বতা দীর্ঘতা সংস্কৃতের মত নির্দিষ্ট নয় এবং দৃশ্যতঃ অনিয়ম যথেষ্ট, তবু এই অনিয়মের মধ্যেও কিছু নিয়ম রহিয়াছে এবং উহা শিক্ষার্থীর বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য। একথা ঠিক নয় যে মাত্রারীতির দ্বারা বাঙ্লার তিন ধরণের ছন্দের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। পর্বের মত বা যতিবিভাগের মত মাত্রাও বাঙ্লা ছন্দের প্রাণভূত, ছন্দোরূপ অনুধাবনে ইহার মূল্য নগণ্য নহে (ডক্টর্ ক্ষুদিরাম দাস—বাঙ্লা কাব্যের রূপ ও রীতি)। সাধারণ নিয়মগুলি বিবৃত করা যাইতেছে—

(ক) অক্ষরমাত্রিক বা কথিত 'তানপ্রধান' ছন্দে মৌলিক যৌগিক সব অক্ষরই একমাত্রার।

শব্দের শেষ অক্ষরটিতে হসন্ত ব্যঞ্জন থাকিলে ঐ হসন্ত ব্যঞ্জনটিকে অকারান্ত করিয়া একটি অক্ষর ধরিয়া পৃথক্ একমাত্রা গণনা করিতে হইবে।

ইহা অকারণে করা হইতেছে না। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের উচ্চারণে শেষ অক্ষরটি স্বরান্ত ছিল, সুতরাং একমাত্রা লাভের যোগ্য ছিল। আজ উচ্চারণে যদিও আমরা ঐ স্বরটি লোপ করিয়াছি, তবু উহার স্বাধীন মাত্রার স্মৃতিটি রক্ষা করিয়া চলিয়াছি। এইভাবে ধরিলে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির ছন্দের সব অক্ষরই এক মাত্রার এমন সহজ নিয়ম নির্ধারণ করা চলে। "সব অক্ষরই এক মাত্রার, কেবল শব্দের শেষে হলন্ত অক্ষর থাকিলে উহা প্রসারিত করিয়া দুই মাত্রার বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়"—এরূপ নিষেধাত্মক জটিল নিয়মের মধ্যে

যাইতে হয় না।* অতএব এইজাতীয় ছন্দে এক অক্ষর=এক মাত্রা।

(খ) মাত্রাবৃত্ত বা কথিত "ধ্বনিপ্রধান" ছন্দে মৌলিক অক্ষর (আ, ঈ, উ প্রভৃতি যাহা অপভ্রংশ ও সংস্কৃতে দীর্ঘ ছিল) কখনও কখনও দীর্ঘ হইতে পারে, কিন্তু যৌগিক অক্ষর (যৌগিক স্বরান্ত ও যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত) আবশ্যিকভাবে দীর্ঘ বা দুই মাত্রার। ইহার ব্যতিক্রম স্থলে ছন্দঃপতন ঘটে এবং কেহ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে যৌগিক অক্ষরকে একমাত্রার মূল্য দিলে উহা ছন্দের ত্রুটি বলা যাইতে পারে।

(গ) শ্বাসমাত্রিক বা কথিত "শ্বাসাঘাত-প্রধান" ছন্দে যৌগিক অক্ষরের মাত্রা অনিয়মিত। উহা শ্বাসপাতের অধীন। তীব্র শ্বাসানুগ যতি আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণে চার মাত্রার পর পড়ে। এই চার মাত্রা চারটি অক্ষরে (মৌলিক অথবা যৌগিক) হইতে পারে আবার তিনটি বা পাঁচটি অক্ষরেও হইতে পারে। অক্ষর সংখ্যা যাহাই হোক না **ইহার প্রতি পর্বে চার মাত্রাই নিয়ম।** সুতরাং অক্ষরের

* যদি বলা যায়, অক্ষরমাত্রিক বা 'তানপ্রধান' ছন্দে শব্দের অভ্যন্তরের যৌগিক অক্ষরও কখনও কখনও দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হয় এবং তাহা হইলে এক-অক্ষর এক-মাত্রা এরূপ নিয়ম অচল,—তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, ঐরূপ বিশৃঙ্খলা এত স্বল্প যে, উহা ব্যতিক্রম বা কবির ত্রুটি বলিয়া ধরাই সংগত। তাহা ছাড়া দেখিতে হয় যে, এই রীতির ছন্দ (এবং মাত্রাবৃত্ত রীতিরও) অপভ্রংশ হইতে জাত বলিয়া অপভ্রংশ যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘতার স্মৃতি আজও কোথাও কোথাও রহিয়াছে। পূর্বে এরূপ বিশৃঙ্খলা বেশি ছিল, এখন কম। (বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি—ডক্টর দাস)

আধিক্য থাকিলে দুইটি অক্ষরকে সংকুচিত করিয়া একটি অক্ষর গণনা করার আবশ্যকতা হইতে পারে, আবার পর্বে অক্ষরসংখ্যা কম অর্থাৎ তিন হইলে একটি অক্ষরকে টানিয়া দীর্ঘ করিয়া দুই মাত্রা করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহার পর্বসংখ্যা চার মাত্রার বলিয়া ইহার অক্ষর অনিয়ত মাত্রিক এবং ইহার পর্ব নিয়ত চতুর্মাত্রিক। অর্থাৎ ইহার মাত্রার নিয়ম অক্ষরের দিক হইতে না ধরা গেলেও পর্বের দিক হইতে ধরা যায়। ("বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি")

পর্বাঙ্গ ও অর্ধযতি—

আমাদের উচ্চারণে মুখ্য যতির অভ্যন্তরে একটি গৌণ যতি বা মুখ্যাপেক্ষা স্বল্পতর-সময়াত্মক যতি কাজ করে। উহাকে অর্ধযতি বলা যায় এবং উহার দ্বারা বিভক্ত অক্ষরগুলিকে পর্বাঙ্গ নাম দেওয়া যায়। সাধারণ গদ্যের উচ্চারণে ঐ অর্ধযতি গোটা শব্দ অনুসারে পড়ে। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বাক্যে ছন্দঃ-তরঙ্গ রক্ষাকল্পে শব্দের মধ্যেও পড়িতে পারে (মুখ্য যতির ক্ষেত্রেও ইহাই নিয়ম, যদিচ মুখ্য যতি প্রায়শই শব্দের অন্তে পড়ে)। একমাত্র "অমিত্রাক্ষর" ছন্দে শব্দানুযায়ী অর্ধযতিপাত নিয়ম বলা যাইতে পারে। পর্বাঙ্গের ও অর্ধ যতির স্থান উদাহরণযোগে দেখানো যাইতেছে—

(১) মিলহীন অক্ষরমাত্রিক ছন্দে—

নিশার ঃ স্বপন ঃ সম | তোর এ ঃ বারতা |
রে দূত ঃ* অমরবৃন্দ | যার ঃ ভুজবলে |
কাতর ঃ* সে ধনুর্ধরে | রাঘব ঃ ভিখারী |
বধিল ঃ সম্মুখ রণে* | ফুলদল ঃ দিয়া |
কাটিলা কি ঃ বিধাতা শাল্‌ | মলীতরু ঃ বরে |)

(২) মিলযুক্ত অক্ষরমাত্রিক ছন্দে—

(ক) পাখি সব ঃ করে রব | রাতি পোহা ঃ ইল |
কাননে কু ঃ সুম কলি | সকলি ফু ঃ টিল ! ।

(খ) অবজ্ঞার ঃ তাপে শুষ্ক | নিরানন্দ ঃ সেই মরু ঃ ভূমি
রসে পূর্ণ ঃ করি দাও | তুমি ।
প্রভু বুদ্ধ ঃ লাগি | আমি ভিক্ষা ঃ মাগি |
ওগো পুর ঃ বাসী | কে রয়েছ ঃ জাগি |

(৩) মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দে—

(ক) পূর্ণিমা ঃ চন্দ্রের | জ্যোৎস্নাধা ঃ রায় |
সন্ধ্যাব ঃ সুন্ধরা | তন্দ্রাহা ঃ রায় |

(খ) পাড়ময় ঃ ঝোপ-ঝাড় | জঙ্গল ঃ জঞ্জাল |
তীরময় ঃ শৈবাল | পান্নার ঃ টাঁকশাল |

(গ) ঐ আ ঃ সে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জল সিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে

(ঘ) গোপব ঃ ধূজন | বিকশিত ঃ যৌবন |
পুলকিত ঃ যমুনা | মুকুলিত ঃ উপবন |
নীল নীর পর | ধীরস ঃ মীরণ |
পলকে ঃ প্রাণমন | খোয় ।

নিম্নরেখ স্থানগুলিতে অর্ধযতিপাত ঘটে নাই। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে যেখানে দীর্ঘীকরণ-প্রাচুর্য সেখানে টানের জন্য অর্ধযতির বিরাম প্রয়োজনীয় হয় না। সংস্কৃতে অর্ধযতি উচ্চারণের আবশ্যকতা উহার দীর্ঘ উচ্চারণ বহুলতার জন্য খর্ব হইয়াছে। এমন কি সংস্কৃতে পূর্ণযতির

বিরামও বাঙ্‌লার মত এত প্রবল নয়। মাত্রাবৃত্তের উপরের দৃষ্টান্ত-গুলিতে আটমাত্রার পর্বের ক্ষেত্রে চার মাত্রার পর অর্ধযতি এবং ছয় মাত্রার পর্বের ক্ষেত্রে তিন মাত্রার পর অর্ধযতি। অর্ধযতির বিরাম স্বল্প বলিয়া পাঠকের রুচিগত উচ্চারণ ভঙ্গিও উহার সন্নিবেশের স্থান বিষয়ে কতকটা কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) শ্বাসমাত্রিক বা ছড়ার ছন্দে—

(ক) এ পার্ ঃ গঙ্গা | ও পার্ ঃ গঙ্গা | মধ্যি ঃ খানে | চর

(খ) বিন্নুর ঃ বয়স্ | তেইশ্ ঃ যখন্ | রোগে ঃ ধর্‌ল | তারে

ছড়ার ছন্দে চার মাত্রার পর্বে ২+২ ইহাই অর্ধযতিপাতের নিয়ম। যেমন যেমন পর্ব, তেমন তেমন পর্বাঙ্গ। পর্বাঙ্গে আমাদের সমতা নাই এবং পর্বাঙ্গ সর্বত্র শব্দভিত্তিক, ইহা ধরিয়া লইলে ছন্দের মূলে আঘাত করা হয়। ছন্দের সঙ্গে অর্থবোধকতার সম্বন্ধ নাই (একমাত্র "অমিত্রাক্ষর" ও তদনুযায়ী ছন্দ ছাড়া), ছন্দঃ নিজ রাজ্যে স্বাধীন।

মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘীকরণ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ

শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে খুবই যুক্তিযুক্ত-ভাবে নির্দেশ দিয়াছেন যে, পর পর অক্ষরের দীর্ঘীকরণ আমাদের কর্ণপীড়াদায়ক। পর্বাঙ্গে একটি মাত্র অক্ষর প্রয়োজনবশে দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা যাইতে পারে। অবশ্য শব্দের শেষের ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে এইসব বিধি-নিষেধের তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়। ইহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পর্বাঙ্গে একাধিক দীর্ঘীকরণের শ্রুতিকটুতা—

(ক) ॥ ॥ ০ ॥ ● ০ ০ ॥ ০০০০

পঞ্জা ঃ বসিন্ধু | গুজরা ঃ টমরঠা

(খ) ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥●

মেঘলা ঃ থম্‌ থম্‌ | সূর্য ঃ ইন্দু

পর্বাঙ্গে একটি দীর্ঘীকরণের শ্রুতিসুখকরতা—

(ক) রূপো নয় ঃ রাংতা | কী ভীষণ ভুল তার |

॥ ○ ॥ ○ ॥ ○ ॥ ○

বোল্‌তা ঃ বোল্‌তা | বোল্‌তা ঃ বোল্‌তা |

(খ) ॥ ○ ○ ○ ○ ॥ ॥ ○ ○ ॥ ○ ○ ॥ ○

নায়ক ঃ জয়হে | ভারত ঃ ভাগ্যবি | ধাতা

অক্ষরমাত্রিকে দীর্ঘীকরণের ব্যাপার নাই (পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শব্দশেষের ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে পূর্বস্মৃতি অনুযায়ী ১+১=দুই অক্ষর ধরিতে হইবে, আর শব্দের মধ্যবর্তী যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণকে ছন্দের ভুল ধরিতে হইবে)। শ্বাসমাত্রিকে উচ্চারণ রীতি তীব্র শ্বাসপাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া ইহাতে দীর্ঘীকরণ (এমন কি সংকোচনও) পর পর ঘটিলেও উচ্চারণে শ্রুতিকটু হয় না। তবু এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, পর্বাঙ্গের মধ্যে দুইবার দীর্ঘীকরণ হইতেছে না। অর্থাৎ অন্যভাবে বলিতে হয় যে, কোথাও দীর্ঘীকরণ ঘটিলেই উহার পর অর্ধযতি বসিবে। যেমন,

(ক) ॥ ˊ ○ ○ ○ ● / ○ ○

কাক্‌ ঃ কালো | কোকিল্‌ ঃ কালো |

(খ) ˊ ॥ ॥ ˊ

তাই ঃ তাই | তাই

॥ ˊ ॥ ˊ

নাই ঃ নাই | নাই

বাঙলা তিন রীতির ছন্দোবিভাগ

(ক) অক্ষরবৃত্ত (তানপ্রধান বা আমাদের মতে "অক্ষরমাত্রিক")

বলা হইয়াছে "তানপ্রধান" ছন্দে একটি তান বা সুরের প্রবাহ থাকে যাহার প্রভাবে মৌলিক-যৌগিক যাবতীয় অক্ষর হ্রস্ব হয় বা একমাত্রার মূল্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই একীকবণ শক্তিকে "শোষণশক্তি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ফলে এই জাতীয় ছন্দে মৌলিক-যৌগিক, কোমল-পরুষ যাবতীয় অক্ষরের যথেচ্ছ বিন্যাস পর্ব ও চরণের মধ্যে করা যায়। যৌগিক অক্ষরের স্থানে মৌলিক এবং মৌলিক অক্ষরের স্থানে যৌগিক বসাইলে মাত্রার অর্থাৎ উচ্চারণকালের পরিমাণের কোনও ব্যতিক্রম হয় না, যেমন—

(১) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

পাখি সব ঃ করে রব | রাতি পোহা ঃ ইল

● ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

এবং—পক্ষী সর্ব কর্লে শব্দ | রাত্রি প্রভা ঃ তিল |

(২) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

পাষাণ মিলায়ে যায় | গায়ের বাতাসে |

○ ●○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○

এবং—প্রস্তর মূর্চ্ছিয়া পড়ে | গাত্রের সন্তাপে |

অক্ষরমাত্রিক ছন্দের পয়ারের চরণে যৌগিক অক্ষর বহনের ক্ষমতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

এই ছন্দোরীতির এই স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা গুণের জন্যই (শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়) বাঙলা কাব্যে এই রীতির ছন্দের

ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতে একাধারে প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণের প্রয়োজনমত সমাবেশ করা যাইতে পারে।

অক্ষরবৃত্তের রূপবৈচিত্র্য

অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির মূল ছন্দ হইল **পয়ার**। অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্ত রীতির 'পাদাকুলক' ছন্দ হইতে জন্মলাভ করিয়া অক্ষরবৃত্তের (১ অক্ষর = ১ মাত্রা) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পয়ারের চরণবন্ধ চতুর্দশ অক্ষরের। অষ্টমাক্ষরের পর যতি। চতুর্দশ অক্ষরে পতিত ছেদের স্থানে যতি তো আছেই। তা ছাড়া ইহার দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ মিল। যেমন,

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর | জনকের বালা।
বিজনে করেন বাস | রচি পর্ণশালা॥

এই পয়ারেরই পর্ববিন্যাস আরও দীর্ঘ করিয়া ৮+১০ অক্ষর গ্রথিত করিয়া অধুনা মহাপয়ার নির্মিত হইতেছে। যেমন—

একথা জানিতে তুমি | ভারত-ঈশ্বর শাজাহান |
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধন মান॥

পয়ারের প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, **ত্রিপদীর** প্রতি চরণে তিনটি পর্ব। উহার প্রথম দুইটি পর্বের শেষাক্ষরে মিল থাকাই সাধারণ নিয়ম। ত্রিপদীর এক চরণ ছাপিতে দীর্ঘ হয় বলিয়া দুই পঙ্‌ক্তিতে সন্নিবেশ করা হইয়া থাকে। উহা লঘু এবং দীর্ঘ হইতে পারে। লঘু হইলে পর্ব বিভাগ হয় ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ হইলে ৮+৮+৬ বা ৮ বা ১০ অক্ষরে। যেমন,—

(১) বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

(২) নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।

(৩) আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এল কাছে।

চৌপদীতে পয়ারের উপর দুইটি পর্বের প্রসারণ। ইহা লঘু এবং দীর্ঘ হইতে পারে। লঘু হইলে ৬+৬+৬+৫, দীর্ঘ হইলে ৮+৮+৮+৭ বা ৮। ইহার প্রথম তিনটি পর্বের, অন্ততঃ দুইটি পর্বের শেষাক্ষরে প্রায়শঃ মিল থাকে—

(১) রূপেতে ভ্রমরা গুণে ননীচোরা
বিভব ধবলী বসতি গাছে :

(২) মনের তিমির নাশি
উদয় হইল আসি
বিতরে অমৃত রাশি
সুললিত বচনে।

পয়ারের পর্বদ্বয়ে অক্ষর সংখ্যা আরও কমাইয়া একাদশাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর ছন্দও হইতে পারে। একাদশাক্ষর ছন্দের নাম **একাবলী**। ইহার যতিবিভাগ ৬+৫ অক্ষরে।

(১) জগত মোহন | শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবে (র) | ভূত পিচাশ॥

(২) সিনান দোপর | সময় জানি।
তপ্ত পথে পিয়া | ঢালয়ে পানি॥

(৩) ছাড় আই বলা | জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া | আগায় জল॥

ইহা ব্যতীত পয়ারের উপর একাক্ষর বাড়াইয়া **'মালতী'**, পয়ারের পর্বাঙ্গগুলিতে মিল যোজনা করিয়া **'মালঝাঁপ'** প্রভৃতি ছন্দও পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু কবি ত্রিপদী ও চৌপদীর মধ্যে নানাবিধ বৈচিত্র্য আনিয়া এবং মিলের বৈচিত্র্যে স্তবক দীর্ঘ করিয়া পয়ারাশ্রিত ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

"অমিত্রাক্ষর"

অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারাশ্রিত ছন্দে বৈপ্লবিক বৈচিত্র্য আনয়ন করিলেন মধুসূদন। তিনি দেখিলেন পয়ারের নিয়মিত চতুর্দশ অক্ষরের পর ভাবসমাপ্তি অর্থাৎ ছেদ এবং সেই সঙ্গে মিলের নিয়ম ভাবের বহমানতার পরিপন্থী। কাব্যার্থের প্রয়োজনে ভাবকে চরণ হইতে চরণান্তরে প্রসারিত না করিলেই নয়। ফলতঃ তিনি পয়ারের চরণ শেষে ছেদবিন্যাসের অবশ্যকরণীয়তা তুলিয়া দিলেন এবং ছেদকে ভাবানুসারে পরবর্তী, তৎপরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে এমনকি তাহারও পরে প্রায় যে কোনও স্থানে বিন্যস্ত করিয়াছেন। ইহাই কথিত অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ। গৌণ লক্ষণ হইল চরণান্তের অনুপ্রাস বা মিল তুলিয়া দেওয়া। যদিও এই গৌণ লক্ষণ দৃষ্টেই উহার নাম দেওয়া হইয়াছে। মুখ্য লক্ষণ দৃষ্টে উহার নাম হইবে অমিতাক্ষর-ছেদ ছন্দ এবং সব মিলাইয়া হইবে অমিতাক্ষর-অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অমিত্রাক্ষরে ছন্দ বহুলাংশে ভাবের অনুগামী বলিয়া উহার পর্বমধ্যবর্তী অর্ধযতি শব্দান্তে পড়িবে। যদিও মেঘনাদ বধেই ইহার ব্যতিক্রম আছে এবং মুখ্য যতির শব্দ মধ্যে পড়ার দৃষ্টান্তও আছে। অমিত্রচ্ছন্দে

চরণান্তিক ছেদ উঠিয়া যাওয়ায় মুখ্যযতির পূর্ণ বিরাম প্রত্যাশিত। কিন্তু ঐ ছেদ পরবর্তী চরণে প্রথম পর্ব মধ্যে পড়িলে চরণান্ত যতিও দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহাতে বহুক্ষেত্রেই ছেদ ভাবানুযায়ী চরণান্তেও পড়িয়াছে। এই ছন্দে ছেদ ও যতি বিধানের উদাহরণ—

শরদিন্দু ঃ পুত্র ;* | বধূ ঃ শারদ ঃ কৌমুদী,*
তারা ঃ কিরিটিনী ঃ নিশি | সদৃশী ঃ আপনি |
রাক্ষস ঃ কুল ঃ ঈশ্বরী !* অশ্রু বারিধারা |
শিশির,* কপোল ঃ পর্ণে | পড়িয়া ঃ শোভিল !*

তারকাচিহ্ন স্থানে অর্ধচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ। যতির স্থানে ছেদ পতন হইলে সেখানে অনর্থক যতিচিহ্ন দেওয়া হয় নাই। মধুসূদনের শব্দ মধ্যে মুখ্য যতিপাতের একটি উদাহরণ—

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্ | মলী তরুবরে। *

অক্ষরমাত্রিক ছন্দে বিভিন্ন পর্বে পর্বাঙ্গ বিভাগের রীতি এই—

৫ মাত্রায় পর্বে	৩+২
৬ " "	৪+২
৮ " "	৪+৪
১০ " "	৪+৪+২

অবশ্য অমিত্রাক্ষরের ও তদনুযায়ী ছন্দে পর্বাঙ্গ শব্দভিত্তিক হইবে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অক্ষরমাত্রিক রীতির ছন্দে ৫ মাত্রার কম এবং দশমাত্রার বেশি পর্বের চল এখন নাই।

অমিত্রচ্ছন্দের পরবর্তী রূপান্তর

(১) রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষর বা **প্রবহমান পয়ার**—
রবীন্দ্রনাথ অমিত্রচ্ছন্দের মূলনীতি অর্থাৎ চরণান্ত ছেদ প্রথার উল্লঙ্ঘন যদিচ পালন করিয়াছেন, তথাপি পয়ারানুগ মিল দেওয়ার বিধি অপরিবর্তিতই রাখিয়াছেন, আর ছেদ স্থাপন করিয়াছেন ২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি যুগ্ম অক্ষর ও মাত্রার পর। মধুসূদন তিন অক্ষরের পরও ছেদ স্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথ এরূপ প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত ইংরাজি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। দৃষ্টান্ত—

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে | মন্দার মালিকা |
হে মহেন্দ্র* নির্বাপিত | জ্যোতির্ময় টীকা |
মলিন ললাটে* পুণ্য | বল হ'ল ক্ষীণ*
আজি মোর স্বর্গ হতে | বিদায়ের দিন |
হে দেব হে দেবীগণ*

(২) নবীনচন্দ্র-প্রদর্শিত মধ্য যতি স্থানে প্রায়শঃ ছেদ—

*ভাবিতে ভাবিতে |
হইলাম তন্দ্রাগত* ক্রমে দিঙ্মণ্ডল |
কোটি কোটি চন্দ্রালোকে | উঠিল ভাসিয়া*
দেখিলাম সুশীতল | আলোক-সাগরে |
শোভিছে সহস্রদল* মৃণাল তাহার |
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যামা*রয়েছে স্থাপিত |
অনন্ত আলোক গর্ভে* শতদল-দল |
শোভিতেছে সংখ্যাতীত | সবিতৃ-মণ্ডল*
নয়নে লাগিল ধাঁধা*

(৩) গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত স্বাধীন চরণ-বিন্যাস বা গৈরিশ ছন্দ—গিরিশচন্দ্র ৬, ৮, ১০ এর পর্ব বিভাগ ঠিক রাখিয়া বিচিত্রভাবে চরণের বিন্যাস করিয়াছিলেন এবং অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিলপ্রথাও তুলিয়া দিয়াছিলেন। আবার চরণান্তে ভাবসমাপ্তি প্রায়শই বিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতে নাট্যোচিত সংলাপের মধ্যে তিনি ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা আনিতে পারিয়াছিলেন এবং ভাবগত সৌন্দর্যকে রক্ষাও করিয়াছিলেন। যেমন—

(গিরিধারী !) নাহি বাহুবল তব*
চাহ বুঝাইতে | আমি বলাধিক*
ক্ষত্রিয় সমাজে | কথা বটে সম্মানসূচক*
নহি খল আমি* খল তুমি*
অতি ছল অতি খল | অতীব কুটিল |
তুমিই তোমার মাত্র | উপমা কেবল*

(৪) 'বলাকা'র ছন্দোবন্ধ

বলাকায় বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষরের বা তাঁহার পূর্বতন মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষরের ৬, ৮, ১০ এর পর্ববিভাগ মোটামুটি আনিয়া চরণ বিন্যাসে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। কখনও কখনও দুই, তিন, চার মাত্রার একটি পর্বাঙ্গকেও চরণের অধিকার দিয়াছেন। চরণান্ত মিলের বিধানই তাঁহাকে এই পর্বাঙ্গ-চরণের বিন্যাসে অস্বাভাবিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। বলাকার ছন্দ পূর্বোক্ত যতিবিধান ও মিল হইতে মুক্ত নহে, অতএব ইহাকে "মুক্তক

ছন্দ” আখ্যায় অভিহিত করা চলে না। গদ্যচ্ছন্দই একমাত্র মুক্তচ্ছন্দ। দৃষ্টান্ত—

হে সম্রাট-কবি* = ৬
এই তব হৃদয়ের ছবি* = ১০
এই তব নব মেঘদূত = ১০
অপূর্ব অদ্‌ভূত** = ৬
ছন্দে গানে = ৪ (পর্বাঙ্গ)
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে* = ১০
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া = ১০
রয়েছে মিশিয়া* = ৬
প্রভাতের অরুণ আভাসে* = ১০
ক্লান্ত সন্ধ্যাদিগন্তের | করুণ নিশ্বাসে* = ৮+৬
(পূর্ণিমায়) দেহহীন চামেলির | লাবণ্য বিলাসে* = ৮+৬
ভাষার অতীত তীরে * = ৮
কাঙাল নয়ন যেথা | দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে** = ৮+১০

সনেট

ইটালীয় কবি পেত্রার্ক কর্তৃক বিশেষভাবে অবলম্বিত চতুর্দশ চরণের কবিতা। ইহার চতুর্দশ চরণে দুইটি ছন্দোবিভাগ থাকে। প্রথম আটটি চরণে একপ্রকারের মিলবিন্যাস, দ্বিতীয় ছয় চরণে অন্য প্রকারের মিলবিন্যাস। এ দুই বিভাগের নাম octave, বাঙ্‌লায় ‘অষ্টক’ এবং sestet, বাঙ্‌লায় “ষট্‌ক”। ভাবের উত্থান-পতনের দিক হইতেই বোধ হয় মূলতঃ এই দুইটি বিভাগ কল্পিত

হইয়াছিল। মূল ইটালীয় রীতির চরণসমূহের মিলবিন্যাস কখখক, কখখক (প্রথম আট চরণ বা অষ্টক) এবং গঘঙ গঘঙ, অথবা গঘ গঘ গঘ (ঘগ)। ইংরাজিতে শেক্‌স্‌পীয়র মূল সনেটের চতুর্দশ চরণ রাখিয়া অষ্টক ও ষট্‌কের মিলের দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা ত্যাগ করিয়া নূতন সনেটের প্রবর্তন করেন যাহার নাম 'ইংরাজি সনেট'। উহাতে প্রথম বারোটি চরণ তিনটি সমানভাগে বিভক্ত হয় এবং ঐ বিভাগগুলির পৃথক পৃথক মিলের রীতি থাকে। শেষ দুই চরণে আবার ভিন্ন মিল বিন্যাস। যেমন—কখ কখ, গঘ গঘ, ঙচঙচ, ছ ছ। পরবর্তী বহু ইংরেজ কবি সনেটের মধ্য দিয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং মিলবিন্যাসের দিক হইতে কেহ পেত্রার্কা কেহ অর্ধ-পেত্রার্কা অর্ধ-ইংরাজি, কেহ বা বিচিত্র রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকেই অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে কোনও পার্থক্য রাখেন নাই।

মধুসূদন তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কোথাও পেত্রার্কার অনুযায়ী অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ বজায় রাখিয়াছেন। কোথাও রাখেন নাই। সেখানে তিনি বরং মিল্‌টনের পন্থা অনুবর্তন করিয়াছেন। আবার অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ আনিয়াও মিলের বিন্যাসে ইংরাজি সনেটের পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় পেত্রার্কার রীতিকে বরং মান্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমের দিকে লেখা কিছু সনেটে ইটালীয় এবং ইংরাজি রীতি অনুসরণ করিলেও পরে মিলবিন্যাস দুই-দুই চরণে রাখিয়াছেন, যেমন পয়ারাদি ছন্দে হইয়া থাকে। মধুসূদন মিলবিন্যাসে যেমনই হোক রীতিতে সনেটের মধ্যেও 'অমিত্রাক্ষরের' অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রবহমান অর্থাৎ মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষরে তাঁহার নিজস্ব চতুর্দশ চরণের

বহু কবিতা লিখিয়াছেন। মধুসূদন বিরচিত একটি সনেটের উদাহরণ—

"যেয়ো না রজনী আজি লয়ে তারাদলে !	ক
গেলে তুমি, দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে !—	খ
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে।	ক
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !	খ
বারমাস তিতি সতি, নিত্য অশ্রুজলে,	ক
পেয়েছি উমায় আমি। কি সান্ত্বনা-ভাবে—	খ
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারাকুন্তলে,	ক
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মনঃ জুড়াবে !	খ
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে	গ
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—	ঘ
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে !	গ
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি	ঘ
নিবাও এ দীপ যদি"—কহিলা কাতরে	গ
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।	ঘ

পেত্রার্কার পদ্ধতিতে রচিত মোহিতলাল মজুমদারের একটি সনেট—

তোমারে বেসেছি ভালো, সেই ভালোবাসা	ক
কত জন্ম কত যুগ করিব সাধন ;	খ
কত ব্যথা বিরহের অশ্রু অকারণ	খ
কত পাপ, কত তাপ, আশা ও নিরাশা !	ক

তিল তিল করি সেই প্রেম স্বার্থনাশা— ক
ঘুচাবে সকল দ্বন্দ্ব, টুটিবে বাঁধন ; খ
ভব-জন্ম-কল্পবৃক্ষে শ্রীহরি-চন্দন খ
ফুটিবে সার্থক করি' অমৃত-পিপাসা ! ক

আমি যবে তুমি হব সাধনার শেষ— গ
সেইবার হব শুদ্ধ বুদ্ধ অবতার, ঘ
ঘুচিবে প্রেমের তবে পাত্র কাল দেশ, গ
ঘুচিবে বিরহ মোহ বৃথা অহংকার। ঘ
লভিব নির্বাণ-মুক্তি ভাঙি দীপাধার— ঘ
রবে আলো, নাহি রবে অনলের ক্লেশ। গ

(খ) মাত্রাবৃত্ত বা কথিত ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

অপভ্রংশ যুগে ইহার পর্ব বা চরণবিন্যাস মাত্রার সংখ্যার উপর নির্ভর করিত (অক্ষর সংখ্যার উপর নহে), তাই নাম মাত্রাবৃত্ত। বাঙ্‌লাতেও ইহা অক্ষরগণনার উপর নির্ভর করে না। মাত্রার উপর করে, সেজন্য ঐ নাম থাকিলে বুঝিবার পক্ষে তেমন অসুবিধা হয় না। অক্ষরবৃত্তে বা যথাযথভাবে বলিতে গেলে অক্ষরমাত্রিকে এক অক্ষর = একমাত্রা। মাত্রাবৃত্তে পর্বের প্রয়োজন বশে কোনও অক্ষর একমাত্রা, কোনও অক্ষর বা দুই মাত্রা—এই হেতু মাত্রাগণনার দ্বারাই পর্ব ও ছন্দের স্বরূপ বুঝিতে হয়।

এই রীতির ছন্দের অন্তর্গত একটি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের রূপ অনুসারে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ধ্বনিপ্রধান। এ নামটি এই জাতীয় ছন্দের আবৃত্তির রীতি কতকটা নির্ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু ছন্দঃ

স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত অনির্দিষ্ট হইয়া পড়ে। কারণ, ধ্বনির প্রাধান্য বলিতে ঠিকভাবে কিছুই বুঝা যায় না। অথচ আধুনিক বাঙ্‌লায় এই জাতীয় ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, যাহা দ্বারা উহার স্বরূপ প্রকৃষ্টভাবে নির্ণীত হইতে পারে। উহা হইল যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই (যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত) দীর্ঘতা। ইহাতে মৌলিক স্বর অর্থাৎ প্রাচীন দীর্ঘ আ, ঈ প্রভৃতির দীর্ঘতা কখনও কখনও হইয়া থাকে মাত্র, অথচ যৌগিক অক্ষর, যেমন অন্ (অন্ধ), পুন্ (পুঞ্জ), রক্ (রক্ত), বিশ্ (বিশ্ব) প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্ত এবং ঐ, ঔ যুক্ত অক্ষর আবশ্যিকভাবে দীর্ঘ। এজন্য ইহার যথাযথ নাম হওয়া উচিত **যৌগিক-দ্বিমাত্রিক**। উদাহরণ—

|| || || || || oo || o
(১) ঝর্‌ণা : ঝর্‌ণা | সুন্‌দরী : ঝর্‌ণা =৮+৭
o o oo || o o || oo || o
তরলিত : চন্‌দ্রিকা | চন্‌দন : বর্‌ণা।
|| oo || o o || oo || o
অন্‌চল : সিন্‌চিত | গৈরিক স্বর্‌ণে
oo || o o o o || o o || o
গিরিমল্ : লিকা দোলে | কুন্‌তল : কর্‌ণে
oo oo || oo oo o o || o
তনুভরা : যৌবন | তাপসী অ : পর্‌ণা
|| o
ঝর্‌ণা

‖ ০ ● ‖ ০ ০ ‖ ০০ ০০০

(২) ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে =৬+৬+৩

০০ ‖ ০ ● ০ ০ ‖ ০০ ০০ ●

জল সিন্‌চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে

০ ০‖ ০ ০ ●● ‖● ০ ‖●০০ ০ ‖ ০

(৩) ভো মহার্‌ণব | নীল ভৈরব | গর্জদ্‌জল | ভঙ্গে

=৬+৬+৬+৩

‖ ০ ০ ●০ ০ ● ‖ ০০ ০০ ০ ০

(৪) চীন গ ঃ গন হতে | পূর্‌বগ ঃ গন স্রোতে

=৮+৮+৮+৩

‖ ০০ ০০০● ‖ ০

শ্যামল ঃ রসধর | পুন্‌জ

‖ ● ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ১ ১ ● ● ০ ‖ ● ০

(৫) পন্‌চ ঃ শরে | দগ্‌ধ ঃ করে | করেছ ঃ একী | সন্‌ন্যাসী

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পর্বাঙ্গ বিভাগের ক্ষেত্রে **যেখানে পর্বাঙ্গের স্থানে দীর্ঘতা সেখানে পর্বাঙ্গের বিরতি থাকিবে না এবং পর্বাঙ্গ দেখানোর আবশ্যকতা হইবে না।** মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন পর্বে পর্বাঙ্গ বিভাগের রীতি এই—

৫ মাত্রার পর্বে ৩+২

৬ মাত্রার পর্বে ৩+৩

৭ মাত্রার পর্বে ৪+৩

৮ মাত্রার পর্বে ৪+৪

এই রীতির ছন্দে ৫এর কম এবং আট মাত্রার বেশী পর্বের এখন চল নাই। পূর্বে ৯ মাত্রার পর্বও ছিল। প্রাচীন বাংলার মাত্রাবৃত্ত যেখানে আ, ঈ, উ, এ স্বরের বা ঐ স্বরযুক্ত অক্ষরের দীর্ঘতা অধিক তাহাকে কেহ কেহ 'প্রত্নমাত্রাবৃত্ত' নামে অভিহিত করিতে চান। কিন্তু কোন লক্ষণ বেশি অথবা কম থাকার জন্য নামের পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। বৈষ্ণব পদাবলী হইতে উহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

(১) চম্পক ঃ শোণ কু | সুম কন ঃ কাচল |
জিতল গৌর তনু | লাবণি ঃ রে।

(২) জগদা ঃ নন্দ | খঞ্জ ঃ লরুহ | চরণ ঃ কি বলি | হারি রে

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। উহার উচ্চারণ পদ্ধতি এবং মাত্রা গণনা রীতি ইহাতে বহুলাংশে অনুবৃত্ত হইয়াছে। অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতি অপভ্রংশ হইতে জাত হইলেও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্‌লায় ব্রজবুলির মধ্যস্থতাতেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রবেশলাভ করে।

(ডক্‌টর ক্ষুদিরাম দাস—বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি)

(গ) শ্বাসমাত্রিক বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ

এই রীতির ছন্দ প্রাকৃত অপভ্রংশে নাই। সম্ভবতঃ কোল-সম্পর্ক হইতে ছড়া, ব্রতকথা প্রবচন প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙ্‌লায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ইহার প্রধান লক্ষণ পর্বের প্রারম্ভে প্রবল শ্বাসযুক্ত উচ্চারণ এবং

তদনুযায়ী পর্বমধ্যে প্রধানতঃ চারমাত্রা বিন্যাস অর্থাৎ চারমাত্রার পর যতিবিন্যাসের সমতা। ইহার পর্ববর্তী অক্ষরগুলির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা ঐ শ্বাসের এবং তদনুযায়ী চারমাত্রা পাতের অধীন। ফলতঃ যৌগিক অক্ষর একমাত্রারও হইতে পারে দুইমাত্রারও হইতে পারে। মৌলিকও তাই। বলা যায় **অনিয়তমাত্রিক**। উদাহরণ—

(১) প্রাচীন ধামালী—

/০ ০০০ ০০/ ॥ ০০/ ০০ /০০
(ক) আর শুন্যাছ | আলো সই | গোরা রূপের | কথা

০/॥ ০ ০০/ ০০ ০/০০ ০ ০০/
(খ) হলুদ্ বাঁ | টিতে গোরী | বসিল য ¦ তনে

/০০ ০০ ০॥/ ০ ০/০ ০০ ০০
হলুদ্ বরণ্ | গোরা চাঁদ | পড়ে গেল | মনে

(২) প্রাচীন ছড়া—

০০/ ॥ ০॥/ ০
(ক) এসো ঃ পোষ | যেয়ো ঃ না

০/০ ০০ ০॥/ ০
জনম্ ঃ জনম্ | ছেড়ো ঃ না

০/০ ০০ ০০/ ০০ ০/ ০ ০ ০ /০০
(খ) যমুনা ঃ বতী | সরস্ ঃ সতী | কাল্ য ঃ মু নার্ | বিয়ে

(৩) আধুনিক রূপায়ন—

০/০ ০০ ০/০ ০০ ০/০ ০০ /০০
(ক) বিনুর্ ঃ বয়স্ | তেইশ্ ঃ যখন্ | রোগে ধর্‌ল | তারে

০/০ ০ ০ ০/০
ওষু্ ঃ ধে ডাক্ | তারে

০ /০ ০০ ০০/ ০০ ০/০ ০ ০

(খ) (আমি) ছেড়েই ঃ দিতে | রাজি ঃ আছি | সুসভ্ ঃ ভ্যতার্ |

০/০

আলোক্

/০ ০ ০ ০ ০/০ ০ ০ ০/০ ০ ০ /০০

(আমি) চাইনা ঃ হতে | নব ঃ বঙ্গে | নব যুগের | চালক্

শ্বাসমাত্রিক ছন্দে সর্বত্র ২ + ২এ পর্বাঙ্গ বিভাগ।

ছন্দে অনিয়ম

আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার লেখকগণ ছন্দ সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা সচেতন হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছন্দ বিষয়ে শৈথিল্য যে দেখা যায় না এরূপ নহে। শিক্ষার্থীদের যেমন ছন্দোরক্ষণের বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে, তেমনি ছন্দঃশৈথিল্যের দিকটিও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। অধুনা-পূর্ব বাঙ্‌লায় মহাকবিদের রচনাতেও যে কোনও কোনও স্থানে ছন্দোরূপের ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ (১) শব্দ এবং অক্ষরের উচ্চারণ রীতিতে পরিবর্তন, (২) শ্বাসাঘাত রীতির অনুপ্রবেশের ফলে অক্ষরমাত্রিক রীতিতে বিভ্রাট।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হইতে শব্দের অন্তস্থ স্বরধ্বনি উচ্চারণে লুপ্ত হইতে লাগিল। ইহার পর তদ্ভব শব্দের এবং বহুপ্রচলিত তৎসম বা অর্ধতৎসম শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনিরও কখনও কখনও লোপ হইল। ফলে শব্দের অন্তে আঁশ্ তাঁত্, নের্ দের্, মান্ বান্ এরূপ অক্ষর এবং রাঁধনা—রাঁধ্‌না, গা-মুছা—গাম্‌ছা এরূপ যৌগিক অক্ষরের

শব্দমধ্যে প্রাচুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। এইরূপ অক্ষরযুক্ত শব্দ ছন্দে গ্রথিত করিতে গিয়া কবিরা সুবিধামত ঐগুলিকে কখনও পূর্বতন দুই অক্ষরের স্মৃতিবোধে দুইমাত্রা, কখনও বা এক অক্ষরবোধে একমাত্রারূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া শব্দান্তের অথবা শব্দমধ্যের অই, অউ, আই, আউ প্রভৃতি অক্ষর কখনও কখনও স্বাভাবিকভাবে কখনও বা সংকুচিতভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। চান্দ-চাঁদ, ছান্দ-ছাঁদ, বন্ধু-বঁধু এই সকল শব্দের লিখনে ও উচ্চারণে সমতা রক্ষা করা দুরূহ হইল। তদ্ভব যৌগিক অক্ষরের উচ্চারণের প্রভাব তৎসম শব্দের উপরেও পড়িল। এসকলের উপর আবার পুঁথি লেখকরা এবং পালা গায়কেরা কোনও শব্দ এবং অক্ষর বাদ দিলেন, এবং প্রায়শই অধিক শব্দ যোগ করিয়া দিলেন। সুরকার বা গায়ক কিছু রচনা করিয়া থাকিলে তিনি যে সব সময় ছন্দঃ সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন এমনও নহে। ফলে বিশৃঙ্খলা গুরুতর আকার ধারণ করিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতে গিয়া আমরা যদি দেখি যে, চোদ্দ অক্ষর এবং চোদ্দ মাত্রার পয়ারের চরণের সঙ্গে "রাবণ রাজার সানা টোপর বাণের তেজে কাটে" অথবা "অন্য কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম" অথবা "উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতামাতৃ আমা কৈল কোলে" এইরূপ দীর্ঘ চরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা হইলে সে সময়কার উচ্চারণ বিভ্রাট এবং শ্বাসাঘাত ছন্দের প্রভাবের কথাই আমাদের মনে হয়। তদ্ভব যৌগিক অক্ষরের উচ্চারণ বিভ্রাট— তৎসমকেও কিভাবে স্পর্শ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে। ইহাতে যৌগিক অক্ষর অবশ্যই দ্বিমাত্রিক

কিন্তু গোবিন্দদাসের মত কবিকেও ষণ্মাত্রিক পর্বের "ফুল্ল মল্লিকা | মালতী যূথী" ইত্যাদির মল্ অক্ষরটি অথবা ফুল্ অক্ষরটি হ্রস্ব ধরিতে দেখা যায়। অনুরূপ চণ্ডীদাস নামধেয় কবির—

কানড় ছান্দে | কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে |

আবার ঘনশ্যামদাসের—তা সঞে জড়িত | কণ্ঠগত নিরখত
অথবা কবিশেখরের—চলইতে চরণের | সঙ্গে চলু মধুকর |
মকরন্দ পান কি লোভে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যৌগিক অক্ষরের এইরূপ হ্রস্বতাকে আজ আমরা ভুল বলিয়াই ধরি।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ ক্রমশঃ অক্ষর-মাত্রিক ছন্দেও প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ঐরূপ অক্ষরকে প্রয়োজনবশে দীর্ঘ বা হ্রস্ব উচ্চারণ করার একটা রীতি তো আগাগোড়াই ছিল। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ফলে ভারতচন্দ্রের মত কবিও "আল্‌তা ধুইবে পদ | কোথা থুব বল্" পঙ্‌ক্তির 'আল্' এই শব্দমধ্যবর্তী যৌগিক অক্ষরকে দুই মাত্রার মূল্যে স্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের ঐ স্মৃতি আজও লোপ পায় নাই, যাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের মত কবিও "দিক্" শব্দটিকে অক্ষরমাত্রিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী অবস্থায় কখনও এক মাত্রার মূল্যে (যেমন—দিক্ সীমানা) এবং কখনও দুই মাত্রার মূল্যে গ্রহণ করিয়াছেন (দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার)। তবে অধুনা উচ্চারণে যৌগিক অক্ষর অক্ষরমাত্রিকে নির্দিষ্টভাবে একমাত্রার মূল্য পাইয়াছে এবং পূর্বেকার মত উচ্চারণে এবং লিখনে অসামঞ্জস্য এখন আর নাই বলিলেই চলে। তবু ছন্দ

বিষয়ে অনেকের রচনাতেই কিছু না কিছু শৈথিল্যের পরিচয়ও মিলে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপ্নপ্রয়াণ) বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (মন্দ্র ও আলেখ্য) এর নাম উল্লেখ করা যায়। আধুনিক কবি এবং ছন্দোবিৎ মোহিতলালও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যৌগিক অক্ষরকে কিভাবে অবহেলা করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে—

॥
মৃত্ত্যুঃরে কভু | চোখাচোখি দেখি | যাছ
শিহরি সভয়ে | সহসা কাঁধের | কাছে
দুইটি আঙুলে | পরশি তোমার | দেহ
... ...

॥ ॥
রক্ত নয়ন | বিকট বদন | হাসিতে রক্ত | ঝরে
॥
নিশ্শাসে বাক্ | হরে |

॥ ॥
কন্ঠে রজ্জু | জিহ্বা বিগলিত | ভীষণ দশন | মালা
শ্মশানের ধূম | চিতা বণ্হির | জ্বালা —
এসব দেখেছ | আহ্বান শুনেছ ?

ডেকেছ কি নাম | ধরে
সুখরজনীর | ভোরে ইত্যাদি

স্পষ্টতই ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। অথচ নিম্নরেখ স্থানগুলিতে ছন্দঃ-পতন আরও স্পষ্ট।

ছন্দোলিপির প্রস্তুতি সম্পর্কে স্মরণীয় বিষয়

ছন্দের বোধ বিষয়ে কর্ণ সহায়তা করে, চক্ষু নয়। আমাদের উচ্চারিত এবং কর্ণগোচর ধ্বনিসমূহ লেখার হরফে সব সময় ঠিক ঠিক নির্দিষ্ট হয় না। হরফ উচ্চারিত ধ্বনিকে বুঝাইবার একটা রৈখিক ভঙ্গিমা মাত্র। এইজন্য ছন্দঃপদ্ধতি পরীক্ষা করিবার সময় কবিতাংশের চরণগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া কোথায় যতির বিরাম দেওয়া হইতেছে এবং উচ্চারিত অক্ষর ধ্বনিগুলিতে কোথায় হ্রস্ব এবং কোথায় দীর্ঘমাত্রা সন্নিবেশ করিতে হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়।

ধ্বনির প্রাধান্য অথবা তানের প্রাধান্য লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। দেখিতে হইবে পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মে অক্ষরমাত্রিকে হ্রস্ব ধরিয়া যতিবিভাগগুলির উচ্চারিত মোট মাত্রা বা কাল পরিমাণ মিলিয়া যায় কিনা। এরূপ হইলে উহা অক্ষরমাত্রিক। যৌগিক অক্ষর থাকিলে এরূপ ক্ষেত্রে ধরিবার সুবিধা হয়। কারণ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দীর্ঘ। যৌগিক অক্ষর না থাকিলে মৌলিক দীর্ঘ অক্ষর অর্থাৎ আ, ঈ, প্রভৃতির দীর্ঘতা আছে কিনা দেখিতে হয়। সেরূপ না হইলে কোনও যৌগিক অক্ষর মৌলিকের স্থানে বসাইয়া দেখিতে হয় পর্বগত মাত্রামূল্যের বৃদ্ধি হয় কিনা (যেমন, 'শাখা' স্থানে 'বৃক্ষ', 'সাগর' স্থানে 'সমুদ্র' ইত্যাদি)। লিখিত যৌগিক অক্ষরের স্থানে মৌলিক অক্ষর বসাইয়াও দেখা যাইতে পারে যে পর্বগত মাত্রামূল্যের হ্রাস হয় কিনা। যদি হয়, এবং হইলে শ্রুতিকটু লাগে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, অর্থাৎ

পর্বগুলির সমগ্র মাত্রামূল্য অক্ষরের উপর নির্ভর করিতেছে না, করিতেছে মাত্রার উপর। অক্ষরমাত্রিকেও মাত্রা গণনা চাই, তবে যেহেতু ইহাতে এক অক্ষর = নির্বিচারে এক মাত্রা (শব্দশেষের এখনকার উচ্চারিত ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরটিকে পূর্বেকার মত দুইটি অক্ষর ধরিয়া ১ + ১ মাত্রা), সেই হেতু অক্ষরের উপরেই পর্বের ভিত্তি এমনও বলা যায়। যতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি অক্ষরের মাত্রারূপ স্থির হইয়া গেলে একমাত্রা স্থানে ০ চিহ্ন এবং দুই মাত্রা স্থানে ॥ দুই দাঁড়ি বসাইতে হইবে। আমাদের মতে ছন্দোলিপি করার সময় চরণগুলিকে দুইবার বিন্যস্ত করা ভাল। একবার যুক্তাক্ষরগুলিকে পৃথক্ করিয়া বা যৌগিক অক্ষরগুলিকে আলাদাভাবে দেখাইয়া (যেমন, রক্‌ত, পক্‌খ, সন্‌ধ্যা প্রভৃতি) সেই সঙ্গে যতিবিভাগ দেখানো। দ্বিতীয় বারে এগুলিতে মাত্রা বসানো।

শ্বাসমাত্রিক ছন্দের লিপি প্রস্তুতি অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাতে প্রতিটি পর্ব (শেষে অপূর্ণ পর্ব থাকিলে উহা ব্যতীত) নিয়ত চার মাত্রার। এজন্য দুইটি অক্ষরের সংকোচনে একাক্ষর বা এক মাত্রা এবং একটি অক্ষরের কদাচিৎ প্রসারণে দুই মাত্রা করিয়া টানিয়া লওয়ার আবশ্যকতা হইতে পারে। ঐরূপ অনিয়মিত অংশগুলিকে নিম্নরেখ করিলেই চলিবে।

ছন্দে অধিকপদতা—কবিতা নির্মাণে কবিরা কখনও কখনও ছন্দের অতিরিক্ত শব্দও পর্ব বা চরণে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। ইংরাজি ছন্দে এরূপ শব্দের বিশেষণ hyper-metric. বাঙলায় আমরা ইহাকে "অতিচ্ছন্দ" শব্দ বলিতে পারি। চরণান্তের অসম্পূর্ণ-পর্ব শব্দের সঙ্গে ইহার যেন গোলযোগ না হয়।

উদাহরণ—

(ওই) সিন্ধুর টীপ্ | সিংহল দ্বীপ | কান্চনময় | দেশ

(আমি) ছেড়েই দিতে | রাজি আছি | সুসভ্ভ্যতার | আলোক

অধুনাপূর্ব বাঙলায় অতিচ্ছন্দ শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। গায়কদের যোজনা এবং গায়কেরা মুখে যেভাবে গান, তাহারই অনুলিপি লিপিকারগণ বহন করায় ঐরূপ শব্দের প্রাচুর্য ঘটিয়াছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

(১) চৈতন্য রূপিনা | তুমি ব্রহ্মময়ী |

তুমি যেথায় নাই | এমন স্থান আর কই |

(মাগো) তোমায় দিলে বিদায় | সকলি যে যায় |

(২) (তুমি) নিত্য নিরঞ্জিনী | ভবভয়ভঞ্জিনী |

(নিত্য) হৃদি পদ্মে জাগো | পূজি হৃদি মাঝে |

(৩) তাই মনে ভাবি | কি আর করিবি |

(না হয়) বারে বারে দিবি | জঠর যন্ত্রণা |

অতএব এরূপ অংশগুলিকে পর্ববোধের দ্বারা সাবধানে বাদ দিয়া রাখিতে হইবে।

এসকল ছাড়া পর্ববিন্যাসে অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্তও আছে।

চরণ ও স্তবক—কয়েকটি যতি বিভাগ লইয়া একটি চরণ। একটি যতিবিভাগেও যে এক চরণ না হইতে পারে এমন নয়। মিল ধরিয়াও চরণ গণনা করা যায়। সাম্প্রতিক কবিদের কাহারও কাহারও চরণ-বিন্যাস অতি বিচিত্র। এইরূপ কয়েকটি চরণে একটি স্তবক নির্মিত হয়। বলা যায় মিলের বিন্যাসে এবং পয়ার-ত্রিপদী প্রভৃতির বহুবিধ পর্ব ও চরণ বিন্যাসেই স্তবক। মিলের ক্ষেত্রে প্রথম চরণে এবং স্তবকের শেষ চরণে যোগ থাকে। কয়টি চরণে স্তবক হইবে সে সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই। তবু বলা যায়, পয়ারের দুই চরণে, ত্রিপদী এখন ছাপার অক্ষরের চার চরণে, চৌপদীও তাই। পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদীর বহুবিধ মিশ্রণে ছয় আট, দশ বার প্রভৃতি চরণেও স্তবক গঠিত হয়। যে কবিতাংশের ছন্দোলিপি করণীয় উহা সম্পূর্ণ স্তবক না হইলে স্তবক সম্পর্কে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

লয়—লয় সংগীতের বিষয়। দ্রুত, ধীর, মধ্য, বিলম্বিত প্রভৃতি ইহার ভেদ। স্বাভাবিক এক মাত্রা স্থানে দুই মাত্রা বা ততোধিক উচ্চারণে বিলম্বিত। দ্রুত অর্থাৎ দুই মাত্রার এক মাত্রা এবং এক মাত্রার অর্ধ মাত্রা উচ্চারণে দ্রুত—এই সকল নিয়ম সংগীতে দেখা যায়। কবিতার ক্ষেত্রে ঐরূপ লয়ের বিধি প্রবর্তনের কোনও কারণ নাই। কারণ কবিতায় সংগীতের মত ঐরূপ দ্রুত এবং বিলম্বিত উচ্চারণ নাই। ঐরূপ অর্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা, দুইমাত্রা, চারিমাত্রার গাণিতিক উচ্চারণও নাই। তবু যদি বলা যায় যে শ্বাসমাত্রিক ছন্দ অক্ষরমাত্রিক অথবা মাত্রাবৃত্ত রীতি অপেক্ষা দ্রুত উচ্চারিত হয়, মাত্রাবৃত্ত অপেক্ষাকৃত ধীর ভাবে উচ্চারিত হয় সে ক্ষেত্রেও (উচ্চারণ লয় স্থির নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য) উহার নামকরণেরও কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই।

বাঙ্‌লা ছন্দোলিপিতে কত মাত্রায় পর্ব এবং চরণ এবং কোন্‌ রীতির ছন্দ ইহা নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি অংশের ছন্দোলিপি প্রস্তুত করিয়া দেখানো হইতেছে। প্রথমে কয়েকটি পর্বগত অনিয়ততার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—

(১) কে আমার বুকে | চিরতৃষাজর | জর
চাহে শুধু দূর মরী | চিকা |
বৃথা ডাকে তারে | বাপী কূপ সরোবর
অন্তরে জ্বলে | অনির্‌বাপ্য | শিখা

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ষন্মাত্রিক অথবা ৬+৮ এর মিশ্র পর্ব। দ্বিতীয় চরণে অনিয়ততা। উহাকে ষন্মাত্রিক পর্বের ধরিলেও ৬+৪ এর সামঞ্জস্য চতুর্থ চরণের সঙ্গে (৬+৬+২ অথবা ৬+৮ এর সঙ্গে) হয় না।

(২) নিদ্রার পারে রয়ে | ছে সে =৮ +১)
পরিচয়হারা | দেশে =৬(+১)
ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে | উঠে ঝলি =৮(+৪)
পার হয়ে যায় | চলি =৬(+২)

o o o o o o o o • o

অজানার পরে অজা | নায় =৮(+১)

o|| o o o • o

অদৃশ্য ঠিকা | নায়। =৬ +২)

o o oo || oo || o

অতি দূর তীর্থের | যাত্রী =৮(+৩)

o o o o || o

ভাষাহীন রাত্রি =৭

ooo o o o oo

দূরের কোথা যে শেষ =৮

• o o o oo || o o

ভাবিয়া না পাই উদ্ | দেশ =৮(+২)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। মিল হিসাবে নিশ্চয়ই পর পর অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়-চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু ঐরূপ পঙ্‌ক্তি-গুলির মধ্যে পর্ব-সামঞ্জস্য নাই। অর্থাৎ কালগত প্রত্যাশিত সাম্যবোধ ব্যাহত হইয়াছে। ৮+১ বা ৮+৩ এর সঙ্গে ৬+২, এমনকি ৭ মাত্রায় পর্বের সঙ্গতি নিঃসন্দেহে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে।

(৩) কমলিনী | বলে সখি | যে দুঃখে প্রাণ | জ্বলে
[১]অধমের সঙ্গে | থাকিতে হৈলে, | অধর্মের ফল | ফলে
(আমি) চণ্ডালেরে | করেছিলাম | চণ্ডীপূজায় | ভর্তি
রামছাগলকে | দিয়েছিলাম | রামশাল চালের | পথ্যি
[২]মুচিকে করিলাম | [২]পুরোহিত | করি সাবিত্রী | ব্রত
ঠাকুরের জিনিষ | [৩]ঠাকুরকে না দিয়ে[৩] | কুকুরকে দিয়েছি | ঘৃত

জানি বেটা | জন্ম ভেড়া | দিলে কিছু | শিক্ষা পড়া | লাগে যদি | কাজে
তাও কখনও | লাগে কাজে
দগুড়্যের হাতে কি | তব্‌লা বাজে
রামশিঙ্গে যে | বাজায় তার | হাতে কি বাঁশি | সাজে।

শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। কিন্তু বহুস্থানেই প্রয়োজনমত সংকোচন প্রসারণ না করিয়া পাঠ অসাধ্য। এইভাবে ১—১ অংশের পাঠ হইবে "অধম সঙ্গে থাকতে হলে", ২—২ অংশের পাঠ হবে "মুচিক্ কর্‌লাম", ৩—৩ অংশের পাঠ ৪ মাত্রায় করা প্রায় অসম্ভব। ইহা ছাড়া সপ্তম চরণে অধিক পর্বের সন্নিবেশ পূর্বেকার সামঞ্জস্যের বিরোধী হইয়াছে।

কয়েকটি অংশের ছন্দোলিপি

‖ ০০ ‖ ০০ ‖ ০
(১) হুংকৃত ঃ যুদ্‌ধের | বাদ্যে
‖ ০০ ০০০০ ০০ ০০ ‖ ০
সংগ্রহ ঃ করিবারে | শমনের ঃ খাদ্যে
০ ০০০ ০০ ০০ ‖ ০ ০ ‖ ০০
সাজিয়াছে ঃ ওরা সবে | উৎকট ঃ দর্‌শন
‖ ০ ‖ ০ ০০ ০০০০ ‖ ০০
দন্‌তে দন্‌তে ওরা | করিতেছে ঃ ঘর্‌ষণ
‖ ০০ ‖ ০০ ০০০ ০ ০০
হিংসার উষ্‌মায় | দারণ অঃ ধীর
‖ ০০০ ০০ ০০ ০০০০০০
সিদ্‌ধির ঃ বর চায় | করুণানিঃ ধির

আটমাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। শেষ দুই চরণে পর্বে ৮+৬ এর বৈচিত্র্য। প্রথম চরণের দ্বিতীয় পর্ব অসম্পূর্ণ।

‖ ‖ ‖ ‖ ০ ০ ০ ০ ‖ ‖
(২) ঢং : ঢং : ওঁ : কৈ | লাস চূড়া : ক্রাং : ক্রাং
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ‖
হিমজটা : বিগলিত | গঙ্গায়াং : সিকিয়াং
০০ ০০ ০০ ০০ ‖০ ০ ০ ০ ‖
হর হর : হর ঘর | গোমুখী : প্রপাতে
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০
ভেসে আসা : পারিজাত্ | পরে উমা : খোঁপাতে

মাত্রাবৃত্ত। অষ্টমাত্রিক পর্ব। চরণান্তে দীর্ঘীকরণে সংস্কৃত ছন্দের রূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হইয়াছে। পর পর কয়েকটি অক্ষর যেখানে দীর্ঘ হইয়াছে সেখানে অক্ষরে অক্ষরে অর্ধযতির বিরাম আবশ্যক হইয়াছে। গঙ্গায়াং স্থলে পাঠ হইবে গঙায়াং।

০ ০ ০ ০ ‖ ‖ ‖ ‖
(৩) সাত্ ভাই চম্ পা | জা—গো—
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
জাগো জাগো : মোর সাত্ | ভাই
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
নিদাঘের : ভোরে শোন্ | ডাকিছে পা : রুল্ বোন্
০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
অরণ্ ণ্য : মাঝে আর্ | রাত্ নাই
‖ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০
চম্পা গো : চম্পা গো | জাগো ভাই

আটমাত্রার মাত্রাবৃত্ত। কোনও কোনও চরণের শেষে দুই মাত্রা অথবা চারমাত্রার অসম্পূর্ণ পর্ব। পাঁচ চরণে স্তবক।

/ / /

(৪) পত্র : দিল | পাঠান্ : কেসর | খাঁরে

/ /

কেতন্ : হতে | ভূনাগ : রাজার | রাণী।

/ / /

লড়াই : করি | সাধ্ মিটেছে | মিঞা

/ / /

বসন্ : ত যায় | চোখের : উপর | দিয়া

/ / /

এস : তোমার | পাঠান : সৈন্য | নিয়া

/ /

খেল্‌ব : হোরি | আম্‌রা : রাজপু | তানী॥

শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। চরণান্তের অপূর্ণ অংশ ছাড়া সর্বত্র চারমাত্রার পর্ব। অনিয়ম নাই। মিল ধরিয়া বলা যায় ছয় চরণে স্তবক।

বাঙ্‌লা হরফে ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দ

একভাষার ছন্দ অন্য ভাষায় প্রবর্তিত করা যায় না। ইহার কারণ ভাষাবিশেষের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ রীতি। বাংলা শব্দের বা শব্দগুচ্ছের উচ্চারণে আদিতে শ্বাসাঘাত থাকিলেও উহা ইংরাজির accentএর মত তীব্র এবং সংক্ষিপ্ত নহে। তাহা ছাড়া ইংরাজি accent শব্দের মধ্যে বা শেষেও পড়িতে পারে। বাঙলায় accent

কদাপি শব্দের মধ্যে বা শব্দগুচ্ছের মধ্যে বা শেষে পড়িতে পারে না। আমরা এমন বলিতে পারি না যে—

◡◡ / ◡◡ / ◡◡ / ◡

কবীন্ দ্রের | রবীন্ দ্রের | ছন্দ বোধ | নাই

আবার শ্বাসাঘাত প্রথমে দিয়াও এমন উচ্চারণ করা কৃত্রিম ও হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়—

/ ◡ / ◡ / / ◡

বুল্ বুল্ | বিল্ কুল | মশ্ গুল | গন্ধে

অথচ হিসাব ধরিলে প্রথমটি এনাপেষ্ট ও দ্বিতীয়টি ট্রোকেক্ ছন্দের চতুর্মাত্রিক পর্ব। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি ইংরেজি ছন্দ বাংলা তরফে চলে কিনা তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন, যেমন ধরা যাক সত্যেন্দ্রনাথের ড্যাক্টিল্ রীতিতে লেখা—

/ ◡ ◡ / ◡ ◡ / ◡ ◡ ◡

সিন্ ধুর্ টিপ্ | সিংহল্ দ্বীপ্ | কান্চন্ময় | দেশ

প্রভৃতি। পাঠক দেখিবেন ইংরাজিতে যেখানে যেখানে accent দেওয়া হইয়াছে সেখানে সেখানে দুই মাত্রার দীর্ঘ উচ্চারণই শ্রুতি-সুখকর। সুতরাং উহার পাঠ হইবে ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির। বাঙ্লা শব্দগুলি ইংরেজির মত করিয়া উচ্চারণ করিলে যেমন অস্বাভাবিক হয়, তেমনি বাঙ্লা পর্বের উচ্চারণ ইংরেজি রীতিতে করিলে বাঙ্লার প্রাণনাশ করা হয়।

সংস্কৃত ছন্দও অনুরূপভাবে বাঙ্লা ভাষায় চালানো যায় না। সংস্কৃত উচ্চারণরীতির বৈশিষ্ট্য উহার স্থির নির্দিষ্ট হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রাভঙ্গির

উপর। উহাতে অ, ই, উ ঋ ছাড়া সমস্ত স্বর দীর্ঘ এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জনের আগের ব্যঞ্জনটি) মাত্রেই দীর্ঘ বা দুই মাত্রার। বাংলায় সাধারণ উচ্চারণে অক্ষরমাত্রেই হ্রস্ব। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যেখানে মাত্রাসংখ্যার উপর পর্ব-সামঞ্জস্য নির্ভর করে কেবল সেখানে যৌগিক অক্ষর অবশ্য দ্বিমাত্রিক। তাহা ছাড়া আ, ঈ, প্রভৃতির দীর্ঘীকরণও শ্রুতিকটু লাগে না। বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অপভ্রংশের সজাতীয় বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃত উচ্চারণে ও ছন্দে যতির স্থান বাঙ্‌লার ন্যায় মুখ্য নহে। সংস্কৃতে যতির বিরাম অত প্রবল নয়। সংস্কৃত ছন্দে যদিও পাদ অনুসারে কয় অক্ষর (বর্ণবৃত্ত) বা কয়মাত্রা ব্যবহার করা হইয়াছে (মাত্রাবৃত্ত) ইহা গণনা করা আবশ্যক তথাপি ঐ পাদ আবশ্যক মত অত্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে এবং উহার মধ্যবর্তী যতিসমূহ দুর্বল হয়। (ডঃ ক্ষুদিরাম দাস—বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি) সুতরাং বাঙ্‌লায় সংস্কৃত ছন্দোরীতির উচ্চারণ ইংরেজির মতই কৃত্রিম ও হাস্যকর হইতে বাধ্য। তবু বাঙ্‌লায় সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ এবং প্রচলনের চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং সংস্কৃতের বর্ণবৃত্ত না হোক মাত্রাবৃত্তের দুএকটি ছন্দঃপদ্ধতি যে বাংলায় চলে নাই এমন নহে। কিন্তু একথা বলা অসংগত নয় যে সেগুলি ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মিত 'শিখরিণী' ছন্দে হাস্যরসময় নিম্নলিখিত অংশ দেখা যাক—

০ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ০০০০ ০ ॥ ॥ ০ ০ ০ ॥

বিলাতে পালাতে | ছটফট করে ন | ব্য গউড়ে

রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না | যমনসভলা গঃ | শিখরিণী

পরপর ঐরূপ দীর্ঘ উচ্চারণ, আর রস ও রুদ্রের পর (নয় এবং এগার মাত্রার পর) যতি বিধান বাঙালী কর্ণের সুখকর হয় কি ?

কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত বা প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তের তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের প্রচলন করিয়া ছন্দোবৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐগুলি যতিবিভাগে বাঙ্‌লার কাছাকাছি হইলেও এবং প্রচলিত বাংলা পয়ার ত্রিপদীর পাঠের মধ্যে মুখরোচক হইলেও পরবর্তী কবিতাকারেরা এগুলির অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার তোটকছন্দ—

০ ০ ॥ ০০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥
কবি ভা রত তো টক ছন্‌ দভণে

তাঁহার 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' ছন্দের দৃষ্টান্ত—

০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥
মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।

০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥
ভবম্ভম্‌ ভবম্ভম্‌ শিঙা ঘোর বাজে॥

পরবর্তী বাঙ্‌লায় তোটক ছন্দের দু একটি অনুবৃত্তি দেখা যায় যেমন—

০০ ॥ ০ ০ ॥ ০০ ॥ ০ ০ ॥
কতকাল পরে বলভারতরে

০০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥
দুখ সাগর সাঁতরি পা রহবে।

০ ০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥
অথবা, গুরু দেবদয়া করদী নজনে

০ ০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥
অথবা, তুমি নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে

রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসের জন্য এই ছন্দের সঙ্গে সাধারণ মাত্রাবৃত্ত মিশাইয়াছেন—

কতকাল পরে বল ভারতরে।
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে ॥

আধুনিক বাঙ্‌লায় বলদেব পালিত, ভুবনমোহন রায়চৌধুরী প্রভৃতি দু'চারজন সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত এবং বর্ণবৃত্ত উভয় রীতির ছন্দই প্রবর্তনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। উহা তাঁহাদের পরিশ্রমের পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্‌লায় চলে নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন বাঙ্‌লায় আ, ঈ, প্রভৃতিকে বারবার দীর্ঘ ধরায় কৃত্রিম উচ্চারণের উদ্ভব। অতএব তিনি চেষ্টা করিলেন ঐরূপ অক্ষরের স্থানে যৌগিক অক্ষর বসাইয়া সংস্কৃত ছন্দ চালাইতে। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ প্রয়াসও সার্থক হয় নাই। আর দেখা যায়, ঐরূপ ছন্দের উচ্চারণে সংস্কৃতের নির্দিষ্ট মাত্রারীতি নয়, বাঙ্‌লার পর্বরীতিই জয়ী হইয়াছে। সুতরাং এগুলি বাঙ্‌লা ছন্দই হইয়াছে সংস্কৃত হয় নাই। যেমন তাঁহার মন্দাক্রান্তা—

শৈলের পইঠায় | দাঁড়ায়ে আজি হায় | প্রাণ উধাও ধায় | প্রিয়ার পাশ।

মাত্রা গণনায় যদিও সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ঠিকই আছে যেমন—

মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈ র্মোভনৌ তো গযুগ্মম্।

কিন্তু পর্ব বিভাগে মন্দাক্রান্তার নিয়ম অচল। অর্থাৎ সংস্কৃতে ঐ "ধায়" এর পর যতি নাই। অথচ বাঙ্‌লায় ঐখানে যতি না দিলে আমরা উচ্চারণই করিতে পারি না। তা ছাড়া সংস্কৃতের যৌগিক অক্ষরে যে দীর্ঘ উচ্চারণের প্রকার, বাঙ্‌লায় তাহা নাই, হইতেও পারে না।

গদ্যচ্ছন্দ

বাঙ্‌লা গদ্যচ্ছন্দ ইংরাজি Free verseএর দৃষ্টান্তে উদ্ভূত। ইহার প্রয়াস এবং সাফল্য উভয়ই রবীন্দ্রনাথের।

আমাদের প্রচলিত রূপকথায় ক্রিয়াপদকে মধ্যে রাখিয়া এক প্রকার ছন্দোময় গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। উহাই গদ্যচ্ছন্দের মূলে রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত ইংরাজি Free verseএর অর্থ বিভাগের মধ্যে প্রবাহিত সুরসংগতিবিশেষ (Cadence) এবং সংস্কৃত গদ্যের ভঙ্গিও এই ছন্দের নির্মাণে শক্তি দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'য় ছন্দোময় গদ্য নির্মাণের দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু উহাকে চরণে বিভক্ত করিয়া অর্থ-বিভাগের মধ্যেকার সুরের ঐক্যে সামঞ্জস্য দান করিয়া পুরাপুরি গদ্যচ্ছন্দ রচনা করার প্রয়াস তখনও করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের সময়েই গদ্যচ্ছন্দের কাঠামো আয়ত্ত করেন। সে যাহাই হোক, বাঙ্‌লায় গদ্যচ্ছন্দের প্রবর্তনে তাঁহার বেশ কিছু সময় ও পরীক্ষণ কার্য লাগিয়াছিল "পুনশ্চ" কাব্যেই প্রথম তাঁহার সার্থক গদ্যচ্ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই।

প্রশ্ন এই যে গদ্যচ্ছন্দের স্বরূপ কী? ইহার যতিবিভাগ ও মাত্রাবিন্যাস কিরূপ?

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে গদ্যচ্ছন্দ গদ্যই। যে তাল ও রীদম্‌ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তাহারই সামঞ্জস্যময় চরণবিন্যাসের মূর্তি গদ্যচ্ছন্দে। ইহার অক্ষরের মাত্রা গদ্যেরই মত বা অক্ষর মাত্রিক পদ্ধতির ছন্দের মত সর্বত্র হ্রস্ব। যতি সুনির্দিষ্ট

ছন্দোপদ্ধতিতে যেমন বিশেষ একটা ভঙ্গি অবলম্বন করে (যেমন, ৬+১+৫, ৬+৮+৬, ৬+৬+৬+২+৮+১০ ইত্যাদি) এখানে তেমন বাধ্যবাধকতার অধীন নহে। এখানে প্রায় যে কোনও মাত্রা সংখ্যার পরই যতি পড়িতে পারে। এ বিষয়ে ডক্‌টর ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

"মনে রাখতে হবে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের অবিদ্যমানতাই যে এই ছন্দকে গদ্যধর্মী করেছে তা নয়, কারণ, মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রচ্ছন্দও তাহলে গদ্যচ্ছন্দ হ'ত। পয়ারেয় আট-ছয় মাত্রার নিয়মিত রূপকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত অমিত্রচ্ছন্দ বস্তুতঃ পদ্যচ্ছন্দই। খাঁটি গদ্যচ্ছন্দে মোটামুটি চার থেকে এগারো, এমন কি তেরো পর্যন্ত সম-বিষম সমস্ত মাত্রার পর্বই ভাবানুযায়ী বিন্যস্ত থাকে দেখা যায়। এই সমস্ত অসমান মাত্রার পর্ব ও পঙ্‌ক্তিকে সমঞ্জসীভূত করছে একটি বিশেষ শক্তি যা কবিতার অন্তর্নিহিত রসের সঙ্গে একাত্ম।" (রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়)

গদ্যচ্ছন্দে রচিত কবিতাংশের ছন্দোলিপির দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইতেছে—

আর দেখছি, সামনে দিয়ে	=	১০ মাত্রার পর্ব
ষ্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়	=	১১ ,, ,,
শহরের দাদন দেওয়া | দড়িবাঁধা ছাগলছানা	=	১০+৯,, ,,
পাঁচটা-ছটা ক'রে ;		
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর | ছড়িয়ে পড়ে	=	১১+৫,, ,,
কাশের ঝালর-দোলা | শরতের শান্ত আকাশে |	=	৮+৯,, ,,
কেমন করে বুঝেছে তারা	=	১০ ,, ,,
এল তাদের | পূজার ছুটির দিন	=	৫+৮,, ,,

বাঙ্‌লা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

"এ বিষয়ে প্রথমে যে কথাটি স্মরণ করা কর্তব্য তা হ'ল এই যে একমাত্র গদ্যচ্ছন্দ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা ছন্দে কোনও নূতন রীতির প্রবর্তক নন। অক্ষরমাত্রিক, মাত্রাবৃত্ত এবং শ্বাসমাত্রিক পদ্ধতির মধ্যেই তিনি কলাকৌশলের বৈচিত্র্য এনেছেন। সে বৈচিত্র্য স্তবক নির্মাণে, মিলযোজনায়, চরণবিন্যাসে। এ ছাড়া বলা যেতে পারে যে ঃ

অক্ষরমাত্রিক রীতিতে তিনি—

(১) ৮ + ১০ মাত্রার ও অক্ষরের চরণবিন্যাস করেছেন

(২) 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের মধ্যে মিলযোজনা করে এবং মোটামুটি জোড় মাত্রার পর ছেদবিন্যাস ক'রে স্বকীয় একটি পদ্ধতি গঠন করেছেন।

(৩) এই রীতিটিকেই বিস্তৃত ক'রে চরণগুলিকে ভাবানুযায়ী প্রসারিত এবং সংকুচিত ক'রে, এমন কি এক একটি পর্বাঙ্গেও এক একটি চরণ গঠন করে বলাকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন। .....

(৪) এই জাতীয় ছন্দে ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষটপদী অষ্টপদী প্রভৃতি পূর্বেকার যাবতীয় বৈচিত্র্য তিনি রক্ষা করেছেন।

মাত্রাবৃত্তে রবীন্দ্রনাথ—

(১) ছ'মাত্রার পর যতিস্থাপনে অধিক আগ্রহশাল হ'লেও আট, সাত, পাঁচ মাত্রার পর যতিপাতেও উচ্চাঙ্গের সাবলীলতা প্রদর্শন করেছেন।

(২) এই ছন্দে রচিত কয়েকটি গীতে ('দেশ দেশ নন্দিত করি') অপভ্রংশের মতই সর্বত্র আ, ঈ, উ প্রভৃতি মৌলিক স্বরেরও দীর্ঘীকরণ করেছেন।

(৩) অক্ষরমাত্রিকের মত মাত্রাবৃত্তেও তিনি স্তবক নির্মাণের এবং স্তবক-মধ্যবর্তী অন্ত্যানুপ্রাস যোজনার বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। মধ্যবর্তী দুই অথবা তিন চরণে একই প্রকার মিল, ও স্তবকের দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম অক্ষরে ভিন্ন মিল দেওয়া হয়েছে এরকম কবিতা বহু রয়েছে!

(৪) এই মাত্রাবৃত্তেই তাঁর কলাবিলাস-নৈপুণ্যের চরমতা দেখা গিয়েছে, মাধুর্যময় সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপ্রাসের ব্যবহারে পরবর্তী বহু কবির তিনি অনুকরণীয় হয়েছেন। পর্বে পর্বে এমন কি পর্বাঙ্গে পর্বাঙ্গেও প্রত্যাশিত স্থানে যৌগিক অক্ষরের ব্যবহার তার এরকম কলানৈপুণ্যের উদাহরণ, যেমন, পূর্ণিমা : চন্দ্রের | জ্যোৎস্নাধা : রায় ॥ সন্ধ্যাব : সুন্দরা | তন্দ্রা হা : রায় ॥···কোথা হা : হন্ত | চির ব : সন্ত··· ইত্যাদি।

শ্বাসমাত্রিক ছন্দে—

···(১) সংকোচন প্রসারণের আধিক্য থেকে মুক্ত ক'রে তিনি একে অনেকটা সাবলীল ক'রে তুলেছেন।

(২) মাত্রাবৃত্তের মত স্তবক নির্মাণ এবং মিল যোজনার বৈচিত্র্য এনেছেন।

(৩) 'বলাকা'র মত চরণবিন্যাসের স্বাধীনতা এতেও অবলম্বন করেছেন, যেমন, "পলাতকা" কাব্যে।"

(বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি)

অলংকার

"সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ"। অলংকার হইল কাব্যের সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের অনুভব চিত্তের মধ্যে এক বিশেষ প্রকার আহ্লাদের আবির্ভাব আনে। ইহারই জন্য লোকে কাব্য পাঠ করে ও শোনে। অতএব বলা যায়—"কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ"। কিন্তু অলংকার বলিতে দেহের অলংকারের মত বহিরঙ্গ বস্তু নয়। যে অলংকার ছাড়া কাব্যের প্রকাশ নাই ("যাহা প্রকাশ করিতে গেলে আপনিই অলংকার আসে"—রবীন্দ্রনাথ) তাহাই যথার্থ অলংকার। উহা কাব্যের নির্মাণের সঙ্গে আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, উহার জন্য কবিকে নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হয় না। এই জন্য ধ্বনিবাদিগণ অলংকার লক্ষণে বলিয়াছেন—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥

অর্থাৎ রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে যাহার নির্মাণ কার্যকরী হয় এবং যাহাতে পৃথক্ ভাবে প্রযত্ন লইতে হয় না তাহাই কাব্যের অলংকার।

ব্যাপকভাবে দেখিলে ভাষাভঙ্গির যে কোনও চারুত্বময় নির্মাণই অলংকারের বিষয়। ছন্দও কাব্যের এক প্রকারের অলংকরণ। ছন্দ ছাড়া উক্তিবৈচিত্র্য ছাড়া কাব্যই নির্মিত হইতে পারে না। এইজন্য অলংকার না থাকিলে কাব্য হয় না। কাব্যের সহিত অলংকারের নিত্য সম্বন্ধ।

অলংকার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শ্রুতিগত ধ্বনিমাধুর্য শব্দালংকারের বিষয়, আর অর্থবৈচিত্র্যগত

চিত্রের সৌন্দর্য অর্থালংকারের বিষয়। অর্থালংকার আবার সাদৃশ্য, বিরোধ, ন্যায়, গূঢ়ার্থ প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া বিবেচনার যোগ্য।

শব্দালংকার

(ক) অনুপ্রাস

ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্তি-জনিত সাম্যপ্রতীতি। স্বরের বিষমতা থাকিলেও অনুপ্রাস ব্যাহত হয় না। ঐরূপ সাম্যপ্রতীতির ফল শ্রুতিমাধুর্যজনিত আনন্দানুভব। ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্তির প্রকারকে ভিত্তি করিয়া অনুপ্রাসের তিনটি প্রধান বিভাগ গণনা করা হইয়াছে—

(১) **বৃত্ত্যনুপ্রাস**—কোনও একটি ব্যঞ্জনের একাধিকবার যে-কোনও স্বরসংযোগে আবৃত্তি। আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অথবা একাধিক মিলিত ব্যঞ্জনের দুইয়ের অধিকবার আবৃত্তি। যেমন—

(/০) আজি কমলমুকুলদল খুলিল

(৵০) শরমে সরমাসই মরিলো স্মরিলে, তার কথা

(৶০) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে

(।০) যতনে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী

এখানে প্রথমাংশে বিশেষভাবে ‘ল’ ধ্বনির দ্বিতীয়াংশে ‘ম’ ও ‘র’ ধ্বনির, তৃতীয়াংশে ‘ক’ ও ‘ল’ ধ্বনির এবং চতুর্থাংশে য (জ) ধ্বনির বিভিন্ন স্বর সংযোগ নানা ভাবে আবৃত্তি হইয়াছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ‘কল’ এই একত্রাবস্থিত ব্যঞ্জনদ্বয়ের দুয়ের অধিকবার আবৃত্তিজনিত অনুপ্রাস।

(২) **ছেকানুপ্রাস**—যুক্তব্যঞ্জনের অথবা পাশাপাশি একাধিক ব্যঞ্জনের মাত্র দুইবার আবৃত্তি যেমন—

(/০) নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর

এখানে 'ঞ্জ' এবং 'ম্ব' ধ্বনির মাত্র দুইবার আবৃত্তি।

(৵০) একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত

(৶০) শারদ চন্দ পবন মন্দ

এই দুইটি দৃষ্টান্তে যথাক্রমে 'ঙ্ক' এবং 'ন্দ' ধ্বনির দুইবার আবৃত্তি।

(।০) তপনতপ্ত চির অতৃপ্ত অনন্তরূপ বহ্নি

(।/০) কমল ফুল বিমল শেজখানি

এই দুই দৃষ্টান্তে একত্রাবস্থিত ও 'মল' ব্যঞ্জনের মাত্র দুইবার আবৃত্তি। এরূপ ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুয়ের অধিকবার আবৃত্তি হইলে উহা আর ছেকানুপ্রাস হইবে না, বৃত্তানুপ্রাসের পর্যায়ে পড়িবে, যেমন—

(/০) নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার

(৵০) তোমার মধুর অধর বধূর চিরলাজ সম রক্ত

(৩) **শ্রুত্যনুপ্রাস**—ধ্বনির একেবারে ঐক্য না থাকিলেও, যদি শ্রবণে অনেকটা সাম্য অনুভূত হয়, অর্থাৎ একবর্গীয় ব্যঞ্জন হইলে, অথবা র এবং ল, ড় এবং র, ণ এবং ন; শ, ষ, স এর যে কোনও ব্যঞ্জন হইলে ধ্বনিসাম্যগত যে চারুতা উহাকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলা যায়। যেমন—

(/০) শ্রাবণ ঘন গহন মোহে (এখানে গ ও ঘ এর)

(৵০) আতপ দহন বিথার (এখানে ত, থ ও দ এর)

(৶০) দরদর ধারে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজিরে

(র ও ল এর)

(।০) ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া (ট ও ড এর)

(।/০) ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি (জ ও ঝ এর)

(।৵০) দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে (জ ও ঝ এর)

(।৶০) স্থির জলে নাহি সাড়া পাতাগুলি গতিহারা (ড় ও র এর)

এই সকল অনুপ্রাস চরণের শেষে হইলে অন্ত্যানুপ্রাস, চরণের মধ্যে অর্থাৎ পর্বশেষে হইলে মধ্যানুপ্রাস বলা যায়।

যমক

একই স্বর সংযুক্ত ভিন্নার্থক বা নিরর্থক ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার আবৃত্তি। যেমন—

(১) সুদূর গোঠের শ্যামবার্তা কি স্মরিছে রে বার্তাকু ?

(২) কুসুমের বাস ছাড়ি কুসুমের বাস। (বাস গৃহ, গন্ধ)

(৩) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে। (ভারতচন্দ্র, ভারতবর্ষ)

রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহার বর্ণনে।

(৪) প্রভাকর প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা।

(আলোকে, সকালে)

(৫) জীবে দয়া তব পরম ধর্ম জীবে দয়া তব কই

(জীবে, জীবগোস্বামীতে)

(৬) গিরি, যায় হে লয়ে হর, প্রাণকন্যা গিরিজায়।

পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী বাঁচে পাষাণী গিরি যায়।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে কোথাও যমক মধ্যে, কোথাও অন্তে, কোথাও বা চরণের আদিতে।

শ্লেষ

লক্ষণ—একটিমাত্র শব্দের উচ্চারণে একাধিক অর্থের প্রতীতি। শ্লেষ এক্ষেত্রে শব্দালংকার এবং ইহাকে বিশেষভাবে বলা হয় শব্দশ্লেষ। শব্দশ্লেষে শব্দটি পরিবর্তিত করিলে আর অলংকার থাকে না।

এরূপ শব্দ পরিবর্তন করিলেও যদি অলংকারের হানি না ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শ্লেষটি অর্থনির্ভর এবং ওখানে অর্থশ্লেষ হইয়াছে।

শব্দশ্লেষের উদাহরণ—

(১) কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

(২) বুদ্ধের মতন যাঁর আনন্দ সে নিত্য সহচর

(৩) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

প্রথম উদাহরণে 'কু' শব্দের অর্থ মন্দ এবং পৃথিবী; পঞ্চমুখ= পাঁচমুখ যুক্ত অর্থাৎ বহুকথনশীল এবং পঞ্চানন মহাদেব; দ্বন্দ্ব= মিলন, বিরোধ। দ্বিতীয় উদাহরণে আনন্দ=চিত্তের আহ্লাদ;

বুদ্ধশিষ্যের নাম। তৃতীয় উদাহরণে ঈশ্বর=ভগবান এবং কবি ঈশ্বর গুপ্ত ; প্রভাকর=সূর্য এবং ঐ নামের সাময়িক পত্র।

প্রথম উদাহরণে 'কণ্ঠভরা বিষ' এই উক্তিতে **অর্থশ্লেষ** হইয়াছে, কারণ, উহার পরিবর্তে যদি বলা যায় "কণ্ঠেতে গরল" তাহা হইলেও শ্লেষের হানি ঘটিবে না।

বক্রোক্তি

বক্তব্যকে ঘুরাইয়া অর্থাৎ প্রশ্নচ্ছলে বিবৃত করিলে বক্রোক্তি অলংকার হয় আবার এমনভাবে যদি বলা হয় যে ঐ বক্তব্যের ভিন্ন অর্থও করা যায় তাহা বক্রোক্তি হয়। এইভাবে বক্রোক্তি দুই প্রকার কাকু-বক্রোক্তি ও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

কাকু-বক্রোক্তি—

(১) আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?

(২) কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?

(৩) মাতা আমি নহি ? গর্ভভার-জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?

প্রথমাংশের বক্তব্য 'আমি ডরাই না', দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য 'কেহ ছেঁড়ে না' এবং তৃতীয়াংশের বক্তব্য "আমি মাতা" ইত্যাদি প্রশ্নচ্ছলে জ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্লেষ-বক্রোক্তি—বাক্যটিতে এমন দ্ব্যর্থক শব্দ থাকে যাহাতে

বাক্যের অর্থ ভিন্নভাবেও গ্রহণ করা যায়। ইহারই ফলে উত্তর-প্রত্যুত্তরজনিত চমৎকারিতার উদ্ভব হয়, যেমন—

দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন? (প্রশ্ন)
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন। (উত্তর)

প্রশ্নের মধ্যে নিম্নরেখ শব্দ দুইটিতে শ্লেষ থাকায়, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস্য বিষয়টি এড়াইয়া অন্য জবাব দিতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্লেষ বক্রোক্তির বেশি প্রয়োগ আধুনিক বাঙলায় দেখা যায় না।

পুনরুক্তবদাভাস

পুনরুক্তির মত শুনাইলেও আসলে পুনরুক্তি নয়, এরূপ স্থলে ঐ অলংকার হয়, যেমন—

(১) মদকল করী যথা পশে নলবনে

এখানে 'মদকল' শব্দের অর্থও করী, কিন্তু কবির ইচ্ছানুযায়ী 'মদমত্ত'।

(২) তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে

তনু শব্দের অর্থও দেহ, কিন্তু ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কৃশ বা সুন্দর অর্থে। তবু পুনরুক্তির মত শুনাইয়া চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিয়াছে।

অর্থালংকার

সাদৃশ্য-গর্ভ—উপমা

বর্ণনীয় বস্তুর সহিত অপর কোনও বস্তুর চমৎকারজনক সাদৃশ্য প্রদর্শন।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিশ্বে কোনও দুইটি বস্তু বা ব্যক্তিই

একেবারে সমান নহে। কিন্তু নানা দিকে অসমান হইলেও কোনও কোনও দিকে সদৃশ বলিয়া কবিগণ উহাকেই অবলম্বন করিয়া সাদৃশ্য দেখান। উভয়ের মধ্যে অসমান ধর্ম কিছু প্রদর্শন করেন না। চন্দ্রের সহিত মুখের নানা বিষয়ে বৈসাদৃশ্য, তবু কবি সাধারণ সাদৃশ্য, এমনকি অভেদ প্রদর্শনেও দ্বিধা করেন না। ফলতঃ একথা বলা যায় যে উপমার নির্মাণে এবং সাধারণভাবে সমস্ত অলংকারের নির্মাণের মধ্যে কবি-কল্পনাই মুখ্যভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

উপমা এবং সমস্ত সাদৃশ্য-গর্ভ অলংকারে দুইটি বিষয়কে প্রধান-ভাবে জানিতে হয়—(১) বর্ণনীয় বস্তু বা **উপমেয়** (২) যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয় তাহা বা **উপমান**। মুখ বর্ণনীয় বস্তু হইলে কখনও চাঁদ, কখনও পদ্ম প্রভৃতির সহিত তুলনা দেওয়া হয়। এইগুলিকে বলে উপমান। উপমেয়ের এবং উপমানের আরও কয়েকটি আখ্যা আছে। তাহা জানিয়া রাখা ভালো।

উপমেয় = প্রকৃত, প্রস্তুত, বিষয়।
উপমান = অপ্রকৃত, অপ্রস্তুত, বিষয়ী।

উপমা অলংকারে উপমেয় এবং উপমান ছাড়া আরও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়।

একটি **সাধারণ ধর্ম**, যেমন উজ্জ্বলতা, মলিনতা, তাপ, দীপ্তি, কোমলতা প্রভৃতি, আর একটি বিষয়—**সাদৃশ্যবাচক শব্দ**, মত, যেমন, সদৃশ, যেন, তুল্য, নিভ প্রভৃতি।

এই চারটি অবয়ব কোনও উপমায় পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হইলে

তাহাকে **পূর্ণোপমা** বলা হয়। আর চারটি অবয়বের যে-কোনও একটি বা দুইটি লুপ্ত থাকিলে তাহাকে বলা হয় **লুপ্তোপমা**।

পূর্ণোপমার উদাহরণ—

(১) বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো।

উপমেয় 'পথ'; উপমান 'জিহ্বা'; সাধারণধর্ম 'বক্রতা, শীর্ণতা'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মতো'।

(২) কোষ-মাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্তবিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত।

উপমেয় 'কৃপাণ', উপমান 'বিদ্যুৎ', সাধারণধর্ম 'নিশ্চলতা', 'নিদ্রাগত ভাব', বাচক শব্দ 'সমান'।

(৩) বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

উপমেয় 'রাধা' উহ্য। উপমান যোগিনী, সমানধর্ম 'আহারত্যাগ' প্রভৃতি, বাচক শব্দ 'যেমতি', 'পারা'।

(৪) কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥

উপমেয় 'গোপীপ্রেম', উপমান 'হেম' সাধারণধর্ম 'স্বাভাবিকতা, নির্মলতা, ঔজ্জ্বল্য', বাচক শব্দ 'যেন'।

(৫) বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনো দুঃখে, ঘোমটায় জলদ আঁধারে
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে।

উপমেয় 'মুখ-শশী' (রূপক-পুষ্ট), উপমান 'সুকবিতা', সাধারণধর্ম 'ক্রন্দন, বন্দীত্ব' বাচক শব্দ 'যথা'

লুপ্তোপমা ঃ

(১) কমল-ফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বাচক শব্দ সমাসগত। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে অবশ্য রূপক।

(২) সূর্যকান্ত মণি সম এ পরাণ, কান্তে।

সাধারণধর্ম লুপ্ত।

(৩) নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল।

—এখানেও সাধারণধর্ম লুপ্ত।

(৪) দুটি স্বচ্ছ নেত্র হ'তে
কাঁপিত আলোক, নির্মল নির্ঝরস্রোতে
চূর্ণ রশ্মিসম।

'নেত্র' এই উপমেয়ের উপমান লুপ্ত।

(৫) মেঘ হানে যুঁইফুলি বৃষ্টি ও অঙ্গে

এক্ষণে যুঁইফুলের সঙ্গে বৃষ্টি উপমিত। তুলনাবাচক শব্দ 'মত' প্রত্যয়ে (ই) আবদ্ধ। সাধারণধর্ম নাই।

মালোপমা ঃ

একটি উপমেয়ের বহু উপমানের সঙ্গে তুলনা করিলে মালোপমা (মালা + উপমা) হয়।

(১) দুধের মত মধুর মত মদের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান।

(২) মলিন-বদনা দেবী, হায়রে, যেমতি,
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে !

(৩) যেমন পদ্মের দ্বারা সরসী, শশীর দ্বারা রজনী, যৌবনের দ্বারা বনিতা, তেমনই নীতির দ্বারা রাজ্যশ্রী শোভিতা হইল।

প্রতীপ

উপমেয়কে উপমানরূপে বর্ণনা করিলে প্রতীপ অলংকার হয়। যেমন,

(১) নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।

'কুন্তল' উপমেয়ের 'মেঘ' উপমানই প্রসিদ্ধ। ইহার বিপর্যয় করিয়া কবি কুন্তলকে উপমান এবং মেঘকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) "তব নেত্র সমকান্তি সরোবরে ছিল ইন্দীবর"
এখানে পরিচিত উপমেয় 'নেত্র' উপমানরূপে স্থাপিত।

অনন্বয়

যদি এমন বর্ণনা কর হয় যে উপমেয়ের কোনও উপমান দেওয়াই সম্ভব নয় তাহা হইলে অনন্বয় অলংকার হয়। যেমন,

(১) তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল

(২) গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোঁসাই রে

ব্যতিরেক

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণন।

এই উৎকর্ষ 'নিন্দি' 'জিনি', 'অধিক', প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বুঝানো যায়, আবার বর্ণনাকৌশলে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতিপাদনও করা যায়। দ্বিতীয় ব্যতিরেকটি অধিকতর চমৎকারজনক। যেমন—

(১) বদন জিতল শারদ ইন্দু

এখানে শারদ ইন্দু অপেক্ষা বদনের উৎকর্ষ।

(২) স্ফুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা।

(৩) শত মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জলতলে ফেলিস পামর

উল্লিখিত ধরনের ব্যতিরেক শব্দোপাত্ত। এখন প্রতীয়মান ব্যতিরেকের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) চাঁদ নিভে যাক নিবুক জ্যোৎস্না
তাতে কিবা আসে যায়।
হৃদয়-গগনে তুমি জেগে আছ
অম্লান মহিমায়।

এখানে চাঁদ অপেক্ষা 'তুমি' বা প্রিয়ার অন্ধকার দূরীকরণ বিষয়ে উৎকর্ষ।

(২) পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কতজনা।

স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হয়, কিন্তু গৌরাঙ্গের গুণস্পর্শে রতন হয়, অতএব স্পর্শমণি অপেক্ষা গৌরাঙ্গের গুণোৎকর্ষ।

(৩) মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু-কমল বলি, সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে ॥
চাতক-জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুম-মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥

এখানে প্রসিদ্ধ প্রণয়ের উপমান অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণ-প্রীতির উৎকর্ষ।

(৪) শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!

সীতার মুখনিঃসৃত বাণী বীণাধ্বনি এবং কুহুরব হইতেও মিষ্ট।

রূপক

সুগভীর সাদৃশ্য প্রকটনের জন্য যদি উপমেয়ে উপমানের অভেদ আরোপ করা হয় তাহা হইলে রূপক অলংকার হয়।

উপমায় সাদৃশ্য দেখানো হয় বৈসাদৃশ্য গোপন রাখিয়া। রূপকে বুঝানো হয়, সাদৃশ্য এত বেশি যে দুই অভিন্ন বলা চলে। রূপকের কয়েকটি বিভাগ লক্ষণীয় (১) নিরঙ্গ রূপক, (২) সাঙ্গ রূপক, (৩) পরম্পরিত রূপক।

নিরঙ্গ-রূপক

প্রধান একটি উপমেয়ে একটি উপমানের অভেদারোপ করা হইলে উহাকে নিরঙ্গ-রূপক বলা যায়, যেমন—

(১) নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

এখানে 'নয়ন' উপমেয়ে চকোরের অভেদারোপ।

(২) রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

রূপের সহিত পাথারের এবং যৌবনের সঙ্গে বনের অভেদ

(৩) অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা
লিখিছে আপন নাম।

(৪) প্রেমের নিগড় গড়ি চরণে পরিলি সাধে।

(৫) বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব

(৬) প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
ন ভেল যুগল পলাশা।

(নিরঙ্গ) মালারূপক—

(১) শীতের ওড়না পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

(২) মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ; সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে।
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে।
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম, ভুজঙ্গিনীরূপী
এ কাল-কনকলঙ্কা-শিরে শিরোমণি !

(৩) এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন !

সাঙ্গ-রূপক

বিভিন্ন অঙ্গসহ অঙ্গী উপমেয়ে অনুরূপ বিভিন্ন অঙ্গসহ অঙ্গী উপমানের অভেদারোপ করা হইলে সাঙ্গরূপক হয়।

(১) হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী।

মুখ্য উপমেয় হৃদয় বা অন্তরাত্মায় মুখ্য উপমান বৃন্দাবনের অভেদ আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিভিন্ন অঙ্গগুলির সঙ্গে বৃন্দাবনের বিভিন্ন অঙ্গের অভেদ দেখানো হইয়াছে।

(২) শঙ্খধবল আকাশ গাঙে
স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে,
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?

এখানে অঙ্গী উপমেয় আকাশে অঙ্গী উপমান নদীর অভেদারোপ, অঙ্গ মেঘের ও জ্যোৎস্নার উপর পাল ও তরীর অভেদারোপ। এইরূপ অঙ্গী ধরার উপর অঙ্গ ঘাটের।

(৩) এই জন্ম-মালিকার মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত নয়ন !

উহ্য সংসার জীবনের সঙ্গে মালা-গাঁথার অভেদ। এ দুই মুখ্য বা অঙ্গী। অঙ্গ জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসা, নারী, পুরুষ প্রভৃতি যথাক্রমে মালা, সূচী, ডোর প্রভৃতির সঙ্গে অভেদে আরোপিত।

(৪) কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তর তলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

মূল অঙ্গী উপমেয় নটরাজ (তুমি), অঙ্গী উপমান রাখাল। অঙ্গ সন্ধ্যা, শিঙা, গোষ্ঠগৃহ প্রভৃতিতে অঙ্গ উপমেয়-উপমান একত্র। দিন ও ধেনু প্রভৃতিতে পৃথক্।

পরম্পরিত-রূপক

একটি উপমেয়ে উপমানের অভেদারোপ যদি ভিন্ন উপমেয়ে উপমানের অভেদারোপ বিষয়ে কারণ বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে পরম্পরিত রূপক হয়।

(১) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি কত দিন রবে ?

জীবনের উপর উদ্যানের অভেদারোপ জন্য যৌবনের উপর কুসুমের অভেদারোপ করিতে হইয়াছে।

(২) চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা

চেতনার উপর নটমঞ্চের অভেদারোপ নিদ্রার উপর যবনিকার অভেদারোপের কারণ।

(৩) বক্ষবীণায় বেদনার তার
এই মত পুন বাঁধিব আবার।

বক্ষকে বীণার সঙ্গে অভেদে স্থাপন করায় বেদনাকে তারের সঙ্গে অভেদ করিতে হইয়াছে।

(৪) আঁধারি হৃদয়াকাশ তুই পূর্ণশশী
আমার।

হৃদয়ের সহিত আকাশের অভেদের ফলে মেঘনাদের সঙ্গে পূর্ণশশীর অভেদ।

অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমেয়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্য যে রূপকে উপমানে কোনও বিশেষগুণ বা ধর্মের আরোপ করা হয় তাহাকে অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক বলে।

(১) অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।

"অভিনব হেম" এই বিশেষণ যুক্ত কল্পতরুর সঙ্গে গৌরাঙ্গের অভেদ।

(২) অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।

(৩) তুমি অচপল দামিনী

পরিণাম

একজাতীয় কার্যসাধনের জন্য পরিণামে একরূপতা ঘটিলে পরিণাম।

(১) আমার পাপড়ি মরমে মরিয়া
ফুটিল জীর্ণ কেশররূপে।

(২) তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলংকার

উল্লেখ

উপমেয়কে উপমানের সঙ্গে অভেদে আরোপিত না করিয়া অভেদাত্মক বিবিধ উল্লেখে জড়িত করিলে উল্লেখ অলংকার হয়।

(১) রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, রন্ধনে দ্রৌপদী

(১) এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি।

(নানা ভাবে বঙ্গভূমির উল্লেখ)

ভ্রান্তিমান্

উপমেয়ে উপমানের ভ্রম ঘটার বর্ণনায় ভ্রান্তিমান্ অলংকার হয়।

(১) দেখ, সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয় ভ্রমে বারবার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন।

(চক্ষুদৃষ্টে পদ্মের ভ্রম ঘটিয়াছে।)

(২) চারুহাসিনীর নিশীথহাস্যে আকাশে চকোর উড়ে।

(শুভ্র দশনের দীপ্তিতে অন্ধকার দূরীভূত হইলে জ্যোৎস্না ভ্রমে চকোরের আনন্দ)

(৩) বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা ! ডাকিল ফিঙা আর পাখী যত।

(দেবযানের আভায় সূর্যোদয়ের ভ্রম ঘটাইয়াছে)

সন্দেহ

প্রবল সাদৃশ্য দ্যোতনার জন্য যদি কবি কৌশল করিয়া উপমেয়ে উপমানের সন্দেহ জাগাইয়া তোলেন তাহা হইলে সন্দেহ অলংকার হয়।

(১) কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে ? ওকি বারিধর না গিরিধর ?
কৃষ্ণ-বিষয়ে মেঘের সন্দেহ জাগাইয়া তোলা হইয়াছে।

(২) ইনি রমণী অথবা স্রোতস্বিনী ?
এ চিকুর না বেতসচ্ছায়া ?
এ ভ্রূভঙ্গ, অথবা তরঙ্গ ?
এ অঞ্চল না তটভূমি ?

রমণীর সঙ্গে নদীর এবং রমণীর বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে নদীর বিভিন্ন অঙ্গের সন্দেহ উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

(৩) দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল ?

(৪) সোনার হাতে সোনার কাঁকণ, কে কার অলংকার ?

কঙ্কণ হস্তকে অথবা হস্ত কঙ্কণকে অলংকৃত করিতেছে এই সন্দেহ।

নিশ্চয়

উপমেয় পক্ষে সন্দেহের নিরসন ঘটিতেছে এরূপ বর্ণনা করা হইলে নিশ্চয় অলংকার হয়।

(১) কি আর কহিব, দেব! কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর পদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নি-সম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবর্ণ আভা
অস্ত্রাদির তেজঃসহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষসচমূ মাতি বীরমদে।

ভূকম্পন, প্রলয়াগ্নি-দীপ্তি, সমুদ্রকল্লোল প্রভৃতি উপমানগত সন্দেহে উপমেয়গুলিকে নিশ্চিতরূপে স্থির করা হইয়াছে।

(২) অসীম নীরদ নয়, ঐ গিরি হিমালয়।

প্রথমে হিমালয়ে যেন মেঘের সন্দেহ হইয়াছিল, পরে উপমেয় হিমালয়কে নিশ্চিতভাবে বলা হইয়াছে।

(৩) কতিহুঁ মদন, তনু দহসি হমারি।
হম নহোঁ শংকর, হোঁ বরনারী।
ন হি জটা ইহ, বেণীবিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে, নহ গঙ্গ॥

মদন-সন্তপ্তা রাধিকা কামদেবের নিকট নিশ্চয় কল্পে বলিতেছেন—আমি তোমায় পূর্বশত্রু মহাদেব নই, আমি নারী। মস্তকে জটা নয়, এবং গঙ্গাও নয়, কেশভার এবং তাহাতে মালতীমালা।

অপহ্নুতি

উপমেয়কে নিষেধ বা গোপন করিয়া যেখানে উপমানকে (মিথ্যাকে) স্থাপন করা হয় সেখানে অপহ্নুতি অলংকার হয়।

(১) এ দুর্গ প্রাচীর নয়, ঔরঙ্গজেবের পাষাণ হৃদয়।

(বন্দী শাজাহানের উক্তি)

(২) অশ্রু নয়, অভ্র সুকঠিন।

আসলে অশ্রুই, কিন্তু উহাকে চমৎকারিত্ব সহকারে নিষেধ করিয়া কঠিন অভ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে।

(৩) হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে

মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী,

যুগে যুগে নরনারী অফুরান আঁখিবারি

পুষ্ট করেছে তব বাহিনী।

(৪) নীর-বিন্দু যত

দেখিতে কুসুম-দলে, হে সুধাংশুনিধি,

অভাগীর অশ্রুবিন্দু কহিনু তোমারে !

এখানে উপমেয় নীরবিন্দুকে প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ করিয়া অপ্রকৃত অশ্রুকে স্থাপন করা হইয়াছে ?

মনে রাখিতে হইবে যে, সন্দেহ, নিশ্চয় এবং অপহ্নুতির পশ্চাতে উপমেয়-উপমানভাব অর্থাৎ সাদৃশ্য বর্তমান থাকে। সাদৃশ্য নাই এমন দুইটি বস্তুকে সন্দেহে যোজনা করিলে, অথবা উহাদের একটিকে নিষিদ্ধ করিয়া অন্যটি স্থাপন করিলে এইসব অলংকার হইবে না।

উৎপ্রেক্ষা

কবি প্রতিভাবলে যদি উপমেয় ও উপমান এমনভাবে বর্ণিত হয় যে, উপমানকেই উপমেয় অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া বোধ জন্মে তাহা হইলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কবির বর্ণনা কৌশলে উপমান পক্ষে উৎকট সংশয় পাঠকের চিত্তে জাগরিত হয়। যেমন :—

(১) রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে। যেন তরু তাপি মনস্তাপে
খুলিয়াছে ফেলি সাজ।

এখানে উপমেয় কুসুম-পতন অপেক্ষা উপমান (অপ্রকৃত) সাজ খুলিয়া ফেলা বিষয়েই সত্যতা-সংশয় নির্মাণ করা হইয়াছে।

(২) মধ্যাহ্ন রবির তাপে দগ্ধ করিবর
পশে সরসী মাঝারে।
বুঝি এই দহনের প্রতিশোধ নিতে
নাবী পদ্মিনী সংহারে।

দ্বিতীয়াংশের অপ্রকৃতটিই কবির নির্মাণ বলে সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।

(৩) হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী 'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।

উচ্চ গিরিশ্রেণীর অবরোধ কবিকল্পনার নিশ্চল নিষেধরূপে প্রতীত হইয়াছে।

উপরিলিখিত তিনটি দৃষ্টান্তে উৎপ্রেক্ষার সংশয় যেন, বুঝি এই দুই শব্দের দ্বারা প্রকটিত করা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে, মনে হয়, বোধ হয়, প্রভৃতি শব্দও উৎপ্রেক্ষার বাচক হইতে পারে। এরূপ পরিস্ফুট বাচকতার ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষাকে বলা হয় **বাচ্যা**, এক কথায় **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**। আর যেখানে বাচক শব্দ না থাকে, অথচ উৎপ্রেক্ষা হয় সেখানে উহাকে বলে **প্রতীয়মানা**।

এইরূপ প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ ঃ—

(১) তার আল্‌তা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।

কৃষ্ণচূড়ার দল ঝরিয়া যায় শুকাইয়া গেলে। কিশোরীর আলতা-পরা পায়ের লোভে ঝরায় এই অপ্রকৃতকে সত্য বলিয়া সংশয় হইতেছে। বাচক শব্দ কিছু নাই।

(২) বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরি রঙিন বারাঙ্গনা।

প্রকৃত সন্ধাকাশের রঙীন মেঘ। অপ্রকৃত সজ্জিতা বারাঙ্গনা। উহাই কবির বর্ণনায় সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

(৩) কুহেলী গেল, আকাশে আলো
দিল যে পরকাশি।
ধূর্জটীর মুখের পানে
পার্বতীর হাসি।

(৪) যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ করে
শিবের বৈভব লয়ে গেছে স্থানে স্থানে।
শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে ॥

শিব যখন যোগমগ্ন থাকেন তখন চন্দ্র, গঙ্গা, ফণী, প্রভৃতি বহিরৈশ্বর্য প্রকাশিত হয় না। কবি এই প্রকৃত অবস্থাকে অন্যভাবে, অন্য কর্তৃক লুণ্ঠন বলিয়া আমাদের জানাইতে চাহেন।

অতিশয়োক্তি

অতিশায়িত বর্ণনার ফলে যেখানে উপমেয় অর্থাৎ প্রকৃতকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া উপমানকেই দর্শনীয় করিয়া তোলা হয় সেখানে অতিশয়োক্তি হয়।

উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমানপক্ষের প্রাধান্য, কিন্তু অতি-শয়োক্তিতে উহারই সর্বস্বতা। নির্মাণের দিক হইতে উৎপ্রেক্ষার পরবর্তী ধাপে অতিশয়োক্তি। এজন্য বলা হইয়াছে, উৎপ্রেক্ষায় বিষয়ীর (উপমানের) সাধ্য অধ্যবসায়, অতিশয়োক্তিতে বিষয়ীর সিদ্ধ অধ্যবসায়, অর্থাৎ গ্রাস।

নির্মাণভেদে অতিশয়োক্তির পাঁচটি রূপ (১) সম্বন্ধে অসম্বন্ধ (২) অসম্বন্ধে সম্বন্ধে (৩) ভেদে অভেদ (৪) অভেদে ভেদ (৫) কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যত্যয়।

উদাহরণ :—(ক) ভেদে অভেদ (অথবা রূপকাতিশয়োক্তি)

(১) কী কথা শুনি অদ্ভুত।
এতদিনে কি পড়িল ধরা
অশনি ভরা বিদ্যুৎ!

এখানে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে বিদ্যুতের ভেদ থাকিলেও অভেদ কল্পনা ঃ

(২) ধনুর্ধর ঘনশ্যাম

ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত।

এখানে বর্ণনীয়ের সঙ্গে ব্যাধের ভেদ সত্ত্বেও অভেদ কল্পনা।

(৩) বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি!

চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে!

গগন-রতন শশী চিররাহুগ্রাসে!

মেঘনাদ উপমেয়ের সঙ্গে শাল প্রভৃতির ভেদেও অভেদ।

(খ) অভেদে ভেদ ঃ—

(১) শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,

শোননি কি জননীর অন্তরের কথা?

মুখের বাক্য এবং অন্তরের কথায় অভেদ সত্ত্বেও ভেদ।

(২) দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন।

চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর!

দৃষ্টি এবং নয়নের, চুম্বন এবং অধরের অভিন্নতা সত্ত্বেও ভেদ।

(গ) সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ঃ—

(১) কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু

না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ

তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

এখানে ঐরূপ রভসে যাপিত হওয়ার সঙ্গে কেলিরহস্য অনুধাবনের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও অসম্বন্ধ কবিকল্পিত। অনুরূপ 'লাখ

লাখ যুগ' হৃদয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও অসম্বন্ধ কবি-উদ্ভাবিত। এখানে বিরোধ অলংকারও হইয়াছে।

(২) তোমার নাহি শীতবসন্ত জরা কি যৌবন

শীত বসন্ত জরা যৌবনের সঙ্গে সকলেরই সম্বন্ধ। তবু এ অসম্বন্ধ দ্যোতনা অতিশয়োক্তির পরিচায়ক।

(ঘ) **অসম্বন্ধে সম্বন্ধ** :—

(১) লক্ষ্মী সরস্বতী যদি একঠাঁই হয়।
দেবরাজ লিখে যদি নাগরাজ কয়॥
লিখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।

লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির ঐরূপ করার অসম্বন্ধ থাকিলেও সম্বন্ধ কল্পনা।

(২) শুনেছি মৈথিলা-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে।

ঐরূপ হওয়ার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ কল্পনা।

(৩) সযত্ন সেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

কোথায় চুম্বন-ইতিহাস, কোথায় গোলাপের পত্র। তবু অসম্বন্ধে সম্বন্ধ।

(৪) মাধবী লতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক ?

চন্দ্রালোককে মুষ্টিতে ধরার অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-কল্পনা।

(৬) কার্যকারণের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয় :—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

আসলে পান্না সবুজ বলিয়াই চুনি লাল বলিয়াই চেতনায় তার প্রতিফলন।

সমাসোক্তি

উপমেয়ে উপমানের ব্যবহার (কার্যাদির) আরোপ (ক্রিয়া যোগে অথবা বিশেষণ যোগে) ঘটিলে সমাসোক্তি।

(১) নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরী,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট
তোমার ;

এখানে উপমেয় রাক্ষসপুরীতে উপমান রাজ্ঞীর ব্যবহার সমারোপ।

(২) ভস্ম হইল চৈত্র মাস ; হয়ে অনাথিনী
মুদিলা সিন্দূরবিন্দু বাসন্তী যামিনী !

চৈত্রমাসের উপর নায়ক (মদন) এবং বাসন্তী রাত্রির উপর নায়িকার (রতির) ব্যবহার সমারোপ।

(৩) বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

উপমেয় বসুন্ধরার উপর উদাসিনী গৃহিণীর ব্যবহার সমারোপ।

(৪) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা।

সন্ধ্যার উপর বধূর ব্যবহার সমারোপ।

(৫) ক্রিয়াহীন কর্তা আমি এজগতে
কর্ম ভাই চারিজন;
কর্তা কর্মে করি যোগ ক্রিয়া হয়ে তুমি
সংসার ধর্মের মন্ত্র করিও রচনা।

প্রথমাংশে রূপক। দ্বিতীয়াংশে সংসার কর্মে (উপমেয়ে) ব্যাকরণ শাস্ত্রের ব্যবহার সমারোপ। যাজ্ঞসেনী নাটকে দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের বাক্য।

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা

প্রতিবস্তূপমা—যে অলংকারে উপমেয় বাক্য ও উপমান বাক্যে একই সাধারণ ধর্ম পৃথকভাবে যোজিত থাকিয়া সাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটায়।

দৃষ্টান্ত—যে অলংকারে উপমেয় বাক্য ও উপমান বাক্যের মধ্যে সাধারণ ধর্ম এক না হইলেও সাদৃশ্য থাকে।

নিদর্শনা—উপমেয়বাক্য এবং উপমানবাক্য একত্রাবস্থিত হইয়া অথবা একবাক্যান্তর্গত হইয়া যেখানে দুই বস্তুর সাদৃশ্য প্রকটিত করে।

এগুলির মধ্যে দৃষ্টান্ত এবং প্রতিবস্তূপমার স্বরূপ লইয়া একটু ভুল বোঝার অবকাশ আছে বলিয়া একই উদাহরণের দুইটি পৃথক অলংকার-রূপ দেখানো হইতেছে—

মজিনু বিফলতপে অবরেণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন।

এখানে প্রথমটি উপমেয়-বাক্য, দ্বিতীয়টি উপমান-বাক্য। উপমেয়-বাক্যে বলা হইতেছে—যাহা বরণযোগ্য নয় তাহাকে বরণ করিয়া বিফলতপ করা হইয়াছে। এই ধর্মের সঙ্গে পরবর্তী উপমান-বাক্যের শৈবালে ক্রীড়া করার একরূপতা নাই। ইহার স্থানে যদি থাকিত 'ব্যর্থ পরিশ্রমে' 'নিষ্ফল-প্রযত্নে' "অসাধ্যে সাধিয়া" তাহা হইলে একরূপতা হইত। কিন্তু দেখা যায়, সমানধর্ম বিসদৃশ হইলেও উভয়ের সাম্য বুঝিয়া চমৎকারিত্ব অনুধাবনে আমাদের বাধা নাই। অতএব অলংকার দৃষ্টান্ত। উক্ত বিষয়টি লইয়া প্রতিবস্তূপমা করিলে অবস্থা নিম্নরূপ হইত—

মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
বৃথা পদ্ম-অন্বেষণ শৈবাল ঘাঁটিয়া।

'চলিয়া যাওয়া=হারাইয়া যাওয়া', 'হরণ করা-লুঠ করা', আকর্ষণ করা-মনোজ্ঞ হওয়া'—এই সকল সমান সাধারণধর্ম। দুইটি বাক্যে এইরূপ থাকিলে প্রতিবস্তূপমা হইবে। এইরূপ এক সমানধর্ম না হইলে হইবে দৃষ্টান্ত।

"নিদর্শনায়" দেখিতে হইবে ঐরূপ বাক্য দুইটি এক বাক্যে পরিণত হইয়াছে কিনা।

উদাহরণ—(প্রতিবস্তূপমা):—

(১) বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?

এখানে আশার পূরণ এবং তৃষার শান্তি একই সাধারণ ধর্ম, পৃথক-ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই মাত্র।

(২) লইল

লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে

আছিল রতন যত, হরিল কাননে

নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নিরসি কুসুমে।

হরিয়া লওয়া এবং লুটিয়া লওয়া একই সমান ধর্ম।

(৩) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি

কতদিন রবে ?

নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কিরে ঝলঝলে ?

'ভাতি না থাকা' এবং 'ঝলঝল না করা' একই সমান ধর্ম।

দৃষ্টান্ত ঃ

(১) একাকী গায়কের নহে তো গান,

মিলিতে হবে দুইজনে।

গাহিবে একজন খুলিয়া গলা

আরেক জন গাবে মনে॥

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ

তবে সে ক্রন্দন উঠে।

বাতাসে বনশোভা শিহরি কাঁপে

তবে সে মর্মর ফুটে।

এখানে 'দুইজনে মিলিত হওয়া' এবং 'তটের বুকে ঢেউ লাগা' প্রভৃতি ভিন্ন সমান ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও সাদৃশ্য বোধগম্য হইয়াছে।

(২) তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে

বনবাসী। হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে

ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে

কীটবাস ?

বনবাসীর পদার্পণ করা, দৈত্যের ভ্রমণ করা প্রভৃতির সাধারণ ধর্ম এক নহে। অথচ উপমেয়-উপমানের প্রবল সাদৃশ্য বোধগম্য। অতএব দৃষ্টান্ত।

(৩) কুল পাংশুলার গর্ভে জনম যাহার
সেই দাসীপুত্র হবে মেবারের রাজা ?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ?

'রাজা হওয়া' 'দ্যুতি হরণ করা' 'বিচরণ করা' প্রভৃতি ভিন্ন সমান ধর্ম।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে উপমান-বাক্য একাধিক থাকাতে **মালা দৃষ্টান্ত** হইয়াছে।

'নিদর্শনা :—

(১) সুষমার খনি শকুন্তলারে
নিয়োগে কঠিন তপে যে-ঋষি।
নিশ্চয় নীলপদ্মপত্রে শমীগাছ কাটে সে বনবাসী ॥

প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্য একত্রাবস্থিত হইয়া সাদৃশ্যবোধকতার বিষয় হইয়াছে।

(২) যে-বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার ॥

রাহু কর্তৃক চন্দ্রের আহার এবং সন্ন্যাসী কর্তৃক সুন্দরীর বিবাহ যে এক বস্তু তাহা বর্ণনায় প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্মরণ বা স্মরণোপমা

প্রবল সাদৃশ্য জন্য এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর স্মরণ হইলে স্মরণালংকার হয়। সাদৃশ্য না থাকিলে কোনও স্মৃতির বিষয়ে অলংকার হইবে না।

(১) শরৎ-প্রভাতে শিশির-সিক্ত শুভ্র শেফালি দেখি।
মনে পড়ে যায় বঙ্গ-বিপিনে বিধবা অশ্রুমুখী।

(২) বর্ষার নবীন মেঘ হেরি বৃন্দাবনে।
নব ঘন শ্যামরূপ প'ড়ে গেল মনে।

সাদৃশ্য-ভিন্ন বিষয়ের অলংকার

(ক) বিরোধমূল

১। বিরোধাভাস বা বিরোধ

তুইটি বিষয় বা বাক্যার্থে যথার্থ বিরোধ না থাকিলেও বাহিরে বিরোধ প্রদর্শনের চমৎকারিতা।

(১) সেই সত্য
যা রচিবে তুমি ; ঘটে যা, তা
সব সত্য নহে।

যাহা ঘটে তাহা কেমন করিয়া সত্য নয়—ইহাতে বিরোধ। অর্থতঃ পর্যবসান এই যে বাস্তব অপেক্ষা কাব্য-সত্যের গুণ অধিক।

(২) গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায় ;
হে বন্ধু বিদায়।

পর্যবসান এইভাবে যে প্রণয়ে এইরূপ কার্য ঘটে।

(৩) শ্মশান, ভীষণ তবু নয়।

তাজমহল সম্পর্কে উক্তি বলিয়া বিরোধের পর্যবসান।

(৪) যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

২। বিষম

কারণ যেরূপ কার্য তাহার ভিন্নরূপ হইলে বিষম অলংকার হয়। প্রারব্ধ কর্মের বিপরীত ফল সূচনা এবং দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ বা বিসদৃশ বস্তুকে পাশাপাশি স্থাপন করিলেও এই অলংকার হয়।

বিরোধ অলংকারের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে বিরোধে আপাতবিরোধ দেখান হয়, অর্থে পর্যবসান থাকে। এখানে অর্থে পর্যবসান হয় না। যেমন,

(১) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

এখানে প্রারব্ধ কার্যের বিপরীত ফল হইয়াছে।

(২) কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি,
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।

এখানেও অভিপ্রেত বিষয়ের বিরুদ্ধ ফল লাভ।

(৩) মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ !

সর্প দংশনে মৃত্যু অথচ এই সর্পের দংশনে প্রেমোন্মাদ—ইহাই বিরুদ্ধ ভাব। এখানে বিশেষোক্তি অলংকারের ভাবও নিহিত আছে।

৩। বিভাবনা

কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি ঘটিতেছে এরূপ দেখানো হইলে বিভাবনা অলংকার। যেমন—

(১) নাই রাজা পুরূরবা
তবু ধরা মনোলোভা।

(২) গোলাপ ফোটে না তবু গোলাপের বাস
ঘিরে এরে চিরনিশিদিন।

(৩) বিনা বাতে নিভে গেল মঙ্গল-প্রদীপ

৪। বিশেষোক্তি

ইহা বিভাবনার বিপরীত। কারণ থাকিলেও যদি অনুরূপ কার্যোৎপত্তি না ঘটে তাহা হইলে এই অলংকার হয়।

(১) যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিল গোঁসাই।

এখানে বিষপানাদি কারণ বর্তমান থাকাতেও মৃত্যুর অভাব।

(২) এ ছার নাসিকা মুঞি যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥

এখানে নাসিকা বন্ধ করা রূপ কারণ বর্তমান থাকিলে তদনুযায়ী কার্যের অভাব ঘটিতেছে।

(৩) মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক।

৫। অসঙ্গতি

কারণ একস্থানে এবং কার্য যদি অন্যস্থানে থাকে তাহা হইলে অসঙ্গতি অলংকার হয়।

(১) শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন॥

কারণ শিবের কপালে, অথচ পুড়িল রতির কপাল।

(২) ওদের বনে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে নাচে আমার বুক।

(৩) পূব আকাশে গান গাহে সে
পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি।

(খ) ন্যায়মূল

১। অর্থান্তরন্যাস

সামান্যের দ্বারা বিশেষ ও বিশেষের দ্বারা সামান্য, আর কারণের দ্বারা কার্য ও কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হইলে **অর্থান্তরন্যাস** হয়।

(১) একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির বিশেষ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সামান্যের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

(২) ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান।

প্রথম পঙ্‌ক্তির সামান্য দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির বিশেষ দ্বারা সমর্থিত।

(৩) জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে ?

প্রথমাংশের সামান্য দ্বিতীয়াংশের বিশেষ দ্বারা সমর্থিত।

(৪) হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ নীচ সে দুর্মতি।

প্রথমাংশের বিশেষ দ্বিতীয়াংশের সামান্য দ্বারা সমর্থিত।

২। কাব্যলিঙ্গ

বর্ণিত বস্তুতে এবং বাক্যে যদি চমৎকারজনক হেতু বা কারণের কথা নিহিত থাকে তাহা হইলে এই অলংকার হয়।

(১) হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন পরে।

এখানে চপলতা ক্ষমা করিবার হেতু "এল আষাঢ়ের" ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত।

(২) এস, তোমা চিনিয়াছি শৈশব-সঙ্গিনি ;
কূলে কূলে জলখেলা তোমাতে আমাতে,
ফুল-তোলা তারা-গোণা বাসন্তী নিশাতে
ছাদেতে চাঁদিনী রাতে শৈশব-কাহিনী !

চিনিবার হেতু পরবর্তী বাক্যগুলিতে বিবৃত।

৩। অর্থাপত্তি

মীমাংসকদের গৃহীত এই প্রমাণটি (দণ্ডাপূপ ন্যায় বলে প্রমাণ) যদি চমৎকারিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয় তাহা হইলে ইহা অলংকাররূপে পরিগণিত হয়। বড় ব্যাপারটা ঘটিলে ছোট ব্যাপারটা ঘটিবেই, ইঁদুর যদি দণ্ডাপূপের দণ্ডটি খায় অপূপ (পিষ্টক) বাকি রাখিবে না, এই ধারণা।

(১) তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অন্যজনে কিবা জানে।

(১) নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

৪। অনুমান

ন্যায়শাস্ত্রের এই প্রমাণটি যখন চমৎকারিতার সঙ্গে বিবৃত হয় তখন অনুমান অলংকার হয়।

(১) কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধ ফল।

নক্ষত্র-আলোকে যুদ্ধ ফল পাঠ করিয়াছেন। অনুমান হইতেছে পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইবে।

(২) দেখি নাই আমি মন তব ?
জান না কি প্রেম অন্তর্যামী ?

যেহেতু প্রেম অন্তর্যামী সেই হেতু আমি প্রেমের দ্বারা তোমার অন্তর দেখিয়াছি।

(গ) গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূল

১। অপ্রস্তুত প্রশংসা

অপ্রস্তুতের বর্ণনায় প্রস্তুত ব্যঞ্জিত হইলে এই অলংকার হয়।

(১) কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে।
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলাটিপে ॥
হেন কালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা।
কেরোসিন শিখা বলে এস মোর দাদা ॥

ব্যঞ্জনায় সুবিধাবাদী হীন চরিত্রের মানুষের কথা বলা হইয়াছে।

(২) যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

অপ্রস্তুত ফুল ও নদীর বর্ণনায় প্রস্তুত উদীয়মান তরুণদের কথা বলা হইয়াছে।

(৩) ধরণী জন্মিল হেথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥
নূপুর হৈয়াছে সোনা কী পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥

"আমি সে পুণ্য করি নাই" এরূপ খিদ্যমানা নায়িকার অবস্থা ব্যঞ্জিত।

(৪) ছাড় আই বলা, জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ ॥

সাধারণ কথা বলিয়া বিশেষ নিজের অবস্থা ব্যঞ্জনা করা হইতেছে।

২। ব্যাজস্তুতি

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা অথবা নিন্দার ছলে স্তুতি ব্যঞ্জিত হইলে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়।

(১) কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি (শ্লেষ-নির্ভর)

(২) বন্ধু ! তোমরা দিলে নাক দাম,
রাজ সরকার রেখেছেন মান।
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন !

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি নজরুলের উক্তি। অথ রাজসরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

৩। পর্যায়োক্ত

এক কথা বলিয়া যদি ইঙ্গিতে প্রকারান্তরে অন্য কথা জানান হয় তাহা হইলে পর্যায়োক্ত অলংকার হয়।

(১) এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে,
বিনাইনু যত্নে বেণী, তুলি ফুলরাজি
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির-পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়।

এখানে ঐ সকল বিভিন্ন কার্যের বর্ণনায় নায়িকার অন্তরের রাগোদয় ধ্বনিত করা হইয়াছে।

(২) কোন্ জনপদ বা দেশ আপনি অলংকৃত করেন? কোন্ দেশবাসীকে বিরহপীড়িত করিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন?

—এখানে প্রকারান্তরে প্রশ্ন করা হইতেছে যে আপনার নিবাস কোথায়?

৪। ব্যাজোক্তি

গোপনীয় কোন ভাব প্রকাশিত হইলে প্রকারান্তরে তাহা গোপন করার প্রয়াস যদি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে এই অলংকার হয়।

(১) উমা এল বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা করে জিজ্ঞাসি উমারে,
"আমার শিব তো আছেন ভাল?"
উমা বলে, "আছেন ভাল"—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে "চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?"
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল।

৫। আক্ষেপ

বিশেষ কোন মনোভাব প্রকাশের জন্য আসল বক্তব্যকে বিপরীতভাবে উপস্থাপিত করিলে আক্ষেপ হয়।

বাস্তবিক নিষেধ জানানো হইতেছে না অথবা বিধির দ্বারা নিষেধ জানানো হইতেছে এইরূপ হইলে আক্ষেপ অলংকার হয়। যেমন,

(১) যাও চলি মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!

আসল বক্তব্য হইতেছে এই যে যাইও না, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব—উহা ব্যঞ্জনায় বোঝা যাইতেছে।

(ঘ) শৃঙ্খলামূলক অলংকার

১। একাবলী

পূর্ব পূর্ব পদের বিধেয় যদি পর পর পদের উদ্দেশ্যরূপে স্থাপিত হয় তাহা হইলে একাবলী অলংকার হয়। যেমন,

(১) গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।

(২) শমন-দমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম।

(৩) এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিষ গোঙায়নু
ছোড়লুঁ জীবনক আশা।

২। কারণমালা

একাবলী অলংকারের উদ্দেশ্য বিধেয়ের মধ্যে যদি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে তাহা হইলে কারণমালা অলংকার হয়। যেমন,

(১) লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

(২) রণে যদি মর ঘুষিবে যশ
যশ যার তার দেবতা বশ।

৩। সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইলে সার অলংকার হয়।

(১) পৃথিবীর ভূষণ রাজা, রাজার ভূষণ সভা।
সভার ভূষণ পণ্ডিত, সভা করে শোভা।

(ঙ) বিবিধ

১। তুল্যযোগিতা

প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুত একই গুণ বা কার্যের দ্বারা যুক্ত হইয়া যদি সাদৃশ্যের জন্ম দেয় তাহা হইলে তুল্যযোগিতা অলংকার হয়।

(১) জন জামাই ভাগনা
তিন নয় আপনা।

(২) দেহ ভেঙ্গে দিল জোলো দুধ
আর এই জোলো বৈশাখ।

দুই প্রস্তুতের দেহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া এই কার্যে ঐক্য।

২। দীপক

প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত এই দুইই যখন একপদ বা ধর্ম দ্বারা যুক্ত হয় তখন দীপক অলংকার হয়।

(১) সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।

প্রস্তুত সপত্নী এবং অপ্রস্তুত সাপিনী ও বাঘিনী একই ধর্মের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে।

(২) নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবাতাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ উল্কা তারা
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ দুঃখ দাহ-হারা।

একটি কারকের সহিত বহু ক্রিয়ার যোগ থাকিলেও দীপক অলংকার হয়। যেমন—

হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।

৩। পরিকর

একাধিক সার্থক বিশেষণ যোজনায় পরিকর অলংকার হয়।

হে পদ্মা! প্রলয়ংকরী? হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু!

৪। পর্যায়

একাধিক বিষয়ের পর পর ক্রমানুসারে বর্ণনার চমৎকারিতা।

কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার দ্বারের কাছে।

৫। পরিবৃত্তি বা বিনিময়

দুই পৃথক-জাতীয় বস্তুর বিনিময় সম্পর্ক বর্ণিত হইলে যে চারুতা ফুটিয়া ওঠে তাহাতে পরিবৃত্তি অলংকার হয়।

(১) স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে।

অর্থ, স্নেহের বিনিময়ে রামকে কিনিয়াছ।

(২) নিজ অন্ন পরে করপণ্যে দিলে,
পরিবর্তে ধনে দুরভিক্ষ নিলে।

৬। অন্যোন্য

একই ক্রিয়ার দ্বারা দুই বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন।

(১) তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়।

৭। সহোক্তি

সহার্থক শব্দের যোগে বিভিন্ন বস্তুর এক কার্য সম্পাদনের যে চারুত্ব।

(১) ভূতলে পড়িল তরু, তার সাথে আঁখি ক'টি
জলভারে নামিয়া পড়িল।

(২) অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে।

(৩) চলে নীল শাড়ী
নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর ।

৮। বিনোক্তি

'বিনা' শব্দের চারুত্ব-যোগের প্রয়োগে এই অলংকার হয় ।

(১) পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা ।

(২) সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে ।

৯। অধিক

আশ্রয় ও আশ্রিত বস্তুর একত্র বর্ণনায় যদি এক হইতে অন্যের গুণ অধিক প্রকাশ পায় তাহা হইলে এই অলংকার হয় ।

(১) অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, নহে কভু ভূধর অধীর
সে পীড়নে ।

১০। ভাবিক

অতীত ও ভবিষ্যৎ যাহা প্রত্যক্ষের অতীত তাহাকে যদি প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে এই অলংকার হয়।

(১) শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
…তরুণ দেবতাসম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি চলিয়াছে বনে—
সীতার বিরহভয়ে পুরী অন্ধকার
গগন শ্বসিয়া উঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

১১। সমুচ্চয়

(একটি পাত্রে যেমন বহু কপোত একই সঙ্গে আহার করিতে পারে সেইরূপ ন্যায়ে) যদি একত্র একাধিক কারণ বিন্যস্ত থাকে সেখানে সমুচ্চয় অলংকার হয়।

(১) একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতিদূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন্ পুর॥

১২। তদ্‌গুণ

নিজগুণ ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুর গুণ গ্রহণ।

(১) যে অলি ফিরিছে অধর-অমৃত আশে
সে আজ কৃষ্ণ বরণ ত্যজিয়া ধবল দশন-ভাসে
শ্বেত হয়ে গেল কি রে।

অনার্স প্রশ্নোত্তর

ছন্দ

॥ ১৯৫৪ ॥

১। বাঙলায় যাঁহারা সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও। বাঙলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে কেন তাহার কারণ নির্দেশ কর।

উত্তর ঃ—বাঙলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনের প্রয়াস বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ হইতেই দেখা যায়। গোবিন্দদাস, যদুনন্দন, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের এই প্রয়াস অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কলাশিল্পী ভারতচন্দ্রের লেখনীতে অনেকটা সমগ্র মূর্তি লাভ করে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় স্মরণে রাখিতে হইবে। তাহা এই যে সংস্কৃতেই দুই রীতির ছন্দঃ পদ্ধতি আছে। একটি অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত, যাহাতে চরণে বা পাদে মাত্রাসংখ্যা যাহাই থাকুক না কেন অক্ষর বা বর্ণ গণিলেই ছন্দোরূপটি পাওয়া যায়—উহা বর্ণ নির্ভর। অন্যটি মাত্রাবৃত্ত, যাহা মাত্রা নির্ভর অর্থাৎ যাহাতে চরণ বা পাদে মাত্রাসংখ্যা কত দেখিতে হয়। এই দ্বিতীয় রীতির ছন্দে কতকটা গীতের ভাব আছে, যতির অবস্থানের অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য আছে। সম্ভবতঃ এই রীতির ছন্দ প্রাকৃত অপভ্রংশ হইতে সংস্কৃতে প্রবেশ করে। যাহাই হোক, এই রীতির কতিপয় বিশেষ ছন্দ, যাহা আমাদের উচ্চারণে খুব বেশি পরকীয়

বলিয়া মনে হয় না তাহা অনায়াসে বাঙলায় আসিয়াছে। ভারতচন্দ্র এই মাত্রাবৃত্তরীতির তোটক, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াতকে বাঙলায় রূপ দিয়াছিলেন।

তিনি শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি অভিজাত সংস্কৃত ছন্দভঙ্গিমাকে বাঙলায় আনয়ন করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন উহা বাঙলায় প্রচলিত হইতে পারে না। বাঙলার পক্ষে ঐ সকল ভঙ্গি একান্ত বিজাতীয়। তিনি এমন কয়েকটি সংস্কৃত (বা প্রাকৃত) ছন্দকে নির্বাচন করিয়াছিলেন যাহার রীতি গীতাত্মক, যাহার যতিবিভাগ বাঙালির যতিপ্রবণতাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায় না, যাহার হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রা সন্নিবেশ একটা চমৎকারাধিক্য বলিয়া প্রতীত হয়। ভারতচন্দ্র সমানীত ঐ তিন প্রকার ভঙ্গিমার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

o o ‖ o o ‖ o o ‖ o o ‖
(ক) তোটক— ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
o o ‖ o o ‖ o o ‖ o o ‖
নবযৌবন জোরেরযোগ্য নহে

o o o ‖ o ‖ oo o ‖ o ‖ oo
(খ) তূণক—(জয়) শিবেশ শংকর বৃষধ্বজেশ্বর
o ‖ o ‖ oo o ‖ oo
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।

o ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖
(গ) ভুজঙ্গপ্রয়াত— ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহেভারতী দে।
o ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖ o ‖ ‖
সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে।

এগুলির মধ্যে তোটক ছন্দে পরবর্তীকালে কিছু গীত ও কবিতা বিরচিত হইয়াছে। যেমন "কতকাল পরে বল ভারত রে। দুখসাগর সাঁতারি পার হবে॥" "গুরুদেব দয়া কর দীন জনে" ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বলদেব পালিত প্রমুখ কয়েকজন কবি নির্বি-শেষে সংস্কৃত উভয়রীতির ছন্দ বাংলায় প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস তৎকালেই পাঠকবর্গের উৎসাহ লাভ করে নাই। এখন ঐ সকল কবিতা পুস্তকের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। আধুনিক কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত প্রাকৃত ছন্দ অনুসারে কোনও প্রয়াস করেন নাই। তিনি উহার অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই অবহিত ছিলেন। যদিও বাংলা পর্ববিভাগের মধ্যে মাত্রাবৃত্ত রীতির হ্রস্বদীর্ঘ অক্ষর নিয়মিত করিয়া তিনি বাঙ্‌লার মধ্যেই প্রাকৃত অপভ্রংশের স্বাদ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার এরূপ রচনা সংখ্যায় অতি স্বল্প। একালে যে কবি নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্‌লায় প্রচলনের প্রয়াস করিয়াছিলেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙ্‌লা হসন্ত যৌগিক অক্ষরের বিচিত্র ভাবে সন্নিবেশের ফলে তিনি বাঙ্‌লা ছন্দে একপ্রকার আপাত-চমৎকারিতা ও নূতনত্বের স্বাদ দিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি 'ছন্দের যাদুকর', 'তালসিদ্ধ' ইত্যাদি আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ছন্দ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের কান অতিশয় সজাগ ছিল। তিনি দেখিলেন যে সংস্কৃত ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের স্বভাব বাংলায় পূর্বে যাঁহারা প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা একটি বিষয় সম্পর্কে সাবধান হন নাই বলিয়াই তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছিলেন। উহা এই যে আ, উ, এ, ও এই স্বর-

গুলিকে সংস্কৃতের মত বাঙ্‌লাতেও তাঁহারা সর্বত্র দীর্ঘ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রুতিকটুতা ও কৃত্রিমতার উদয় অনিবার্য ; কারণ, বাঙলায় সাধারণ উচ্চারণে ঐ স্বরগুলি লঘু ও হ্রস্ব, কেবল মাত্রাবৃত্ত কবিতায় আমরা কখনও কখনও ঐগুলিকে দীর্ঘরূপে ব্যবহার করিতে পারি এইমাত্র। অথচ সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্‌লায় অনুবর্তন করিতে গেলে দীর্ঘ অক্ষরের সতত প্রয়োজন। কী প্রকারে উহা সিদ্ধ হইতে পারে, অথচ কৃত্রিমতা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ? সত্যেন্দ্রনাথ এজন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মনে করিলেন, আ, ঊ প্রভৃতি মৌলিক অক্ষর বাঙ্‌লা উচ্চারণে লঘু অর্থাৎ একমাত্রার হইলেও যৌগিক অক্ষর যথা ঐ, ঔ এবং অন্ সন্, সিন্, রক্, হল্, কাল্ প্রভৃতি একমাত্রার একটু বেশি। এরূপ অক্ষরকে আর একটু দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পূর্ণ দুই মাত্রার মূল্যে সর্বদা গ্রহণ করিলে তেমন অস্বাভাবিকতা আসিবে না। এইভাবে বাঙ্‌লা ছন্দে দীর্ঘ অক্ষরের অভাব পূর্ণ করা যায় এবং সংস্কৃত ছন্দোভঙ্গি স্বচ্ছন্দে চালানো যাইতে পারে। এইভাবে সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা, রুচিরা, মালিনী, পঞ্চচামর এবং কয়েকটি বৈদিক ছন্দের রূপও বাঙ্‌লায় দেখাইয়াছেন। ঐ সকল ছন্দে দীর্ঘমাত্রার ভার প্রায়শই বহন করিতেছে ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক অক্ষরগুলি। যেমন—

(ক) মন্দাক্রান্তা—

॥ ॥ ॥ ॥ ০০০ ০০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥

পিঙ্‌গল্ বিহ্‌বল্ ব্যথিত নভতল্ কই গো কই মেঘ্ উদয় হও।

(খ) রুচিরা—

০ ॥ ০ ॥ ০০০ ০ ॥ ০ ॥ ০ ০

তখন্ কেবল্ ভরিছে গগন্ নূতন্ মেঘে।

(গ) মালিনী—

০ ০ ০ ০ ০ ০ ॥ ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ ॥

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্‌ শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর

সত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ কৌশলে দীর্ঘ অক্ষরের সমস্যার সমাধান করিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাতেও সমাধান হয় নাই। কারণ গুরু বা হলন্ত ব্যঞ্জনগুলি ও বাঙ্‌লা উচ্চারণে লঘুর মতই একমাত্রার। মাত্রাবৃত্ত ঢঙের ছন্দে ঐগুলি দীর্ঘ হইলেও, অক্ষরবৃত্তে কদাপি নহে। অক্ষর মাত্রিক ছন্দে ঐগুলি সর্বদা একমাত্রার। ফলে যে সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত তাহার অনুরূপ ছন্দে বাঙ্‌লায় ঐগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ কৃত্রিম। ফলে পূর্বেকার সংস্কৃত ছন্দের প্রচলনকারীরা যেখানে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথও সেইখানেই রহিলেন। আর যদি সংস্কৃতের দীর্ঘতা ও যতিবিভাগ না মানিয়া বাঙ্‌লা যৌগিকের মত উচ্চারণ করা যায় ও বাঙ্‌লার যতিবিভাগ মানা যায় তাহা হইলে একরূপ চলিতে পারে। অর্থাৎ বলা যাইতে পারে যে সত্যেন্দ্রনাথ প্রদর্শিত সংস্কৃত ছন্দোরূপ বাঙ্‌লা নিয়মে স্বাভাবিক এবং সেইরূপেই চলিতেছে, খাঁটি সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করিলে ঐ সকল কবিতার অপমৃত্যু অনিবার্য।

২। প্রশ্ন—"মুক্তবন্ধ" ছন্দ কাহাকে বলা হয়? উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে মুক্তবন্ধের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইয়া দাও।

উত্তর :—মুক্তবন্ধ শব্দটি ফরাসী Verse Libre এবং ইংরাজি Free Verse নামের অনুবাদ। গদ্যচ্ছন্দকেই ঐরূপ নামে অভিহিত করা যায়। বাঙ্‌লায় রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গদ্যচ্ছন্দই মুক্তবন্ধ ছন্দ। কারণ, উহাতে যতিবিভাগের বিশিষ্ট রূপকল্প কোথাও গঠন করা

হয় না। বলাকার ছন্দকে এককালে ভুল করিয়া মুক্তবন্ধ নাম দেওয়া হইয়াছিল। বলাকার কয়েকটি অক্ষরমাত্রিক ছন্দে রচিত কবিতায় চরণ বিন্যাস সম্পর্কে কবি অনেকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হইয়াছিল যে কবি পদ্যের সব বন্ধনই অতিক্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলাকার চরণগুলি অক্ষরমাত্রিকের ৬, ৮, ১০ মাত্রার বা অক্ষরের পর্বে বিন্যস্ত। চরণ গঠন কোথাও একটি বা দুই পর্বে, কোথাও একটি পর্বাঙ্গে। অতএব উহা মুক্তবন্ধ নহে। ঐরূপ অমিত্রাক্ষরও নহে।

(এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে)

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

‖ o ‖ o o ◡ ‖ o o o o o o

(ক) নীল : সিন্ধু : জল | ধৌতচ : রণতল

o o o o ‖ o o ‖ o o ‖ o o

অনিলবি : কম্পিত | শ্যামল : অন্চল

‖ o o ‖ o o ‖ o o ‖ o o

অম্বর : চুম্বিত | ভালহি : মাচল

‖ o o ‖ o o ‖ o o

শুভ্‌ভ্রতু : ষারকি | রীটিনী

(আট মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। ৪ + ৪ এর প্রায়শঃ পর্বাঙ্গ-বিভাগ)

o o͡ • • o o o o o • o o

(খ) (আর) জাগাস্ নে : মা জয়া | অবোধ : অভয়া

• o o • o o o o o o o

কতক : রে উমা | এই ঘু : মাল।

০০০ ⌒০০ ⌒০০ ০০●
(মা) জাগিলে এক্‌বার | ঘুম্‌পাড়াঃ নো ভার

০ ০০ ০০০ ০০০ ০০০
(মায়ের) চন্‌চল ঃ স্বভাব | আছেচি ঃ রকাল

(ষন্মাত্রিক অক্ষরমাত্রিক ছন্দ, পর্বাঙ্গ ৩+৩ এ)

(গ) যথা ঃ দেবতেজে ঃ জন্মি | দানব ঃ নাশিনী
চণ্ডী* ঃ দেব অস্ত্রে ঃ সতী | সাজিলা ঃ উল্লাসে
অট্টহাসি* ঃ লঙ্কাধামে | সাজিলা ঃ ভৈরবী
রক্ষঃকুল ঃ অনীকিনী | উগ্রচণ্ডা ঃ রণে ।**

(কথিত অমিত্রচ্ছন্দ। ৮+৬ পর্বে এক এক চরণ। পর্বাঙ্গ শব্দভিত্তিক। তারকা-চিহ্নিত স্থানে অর্ধচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ)

১৯৫৫

১। বাঙ্‌লা ছন্দের ক্ষেত্রে কেহ কেহ ছেদ ও যতির মধ্যে একটা পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই পার্থক্যটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। বাঙ্‌লা ছন্দে এইরূপ পার্থক্য করার সার্থকতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর :—(ছন্দঃ প্রকরণে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে)।

২। "মাত্রাপদ্ধতির দিক দিয়া বিচার করিলে যে বাঙ্‌লা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে, এরূপ মনে করিবার কোনও যৌক্তিকতা নাই"—এই অভিমতের যাথার্থ্য বিচার কর।

উত্তর—উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যবর্তী অভিমত অর্ধসত্য মাত্র। বাঙলা ছন্দের জাতিগত ঐক্য উহার যতিপাতে ও পর্বগঠনে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ

হইলেও উহার যে তিনপ্রকার রীতি আছে (অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান, যৌগিক-দ্বিমাত্রিক বা ধ্বনিপ্রধান এবং শ্বাসমাত্রিক বা শ্বাসাঘাত প্রধান) তাহার পার্থক্যের মূলে মাত্রারীতির সম্বন্ধ অবশ্য আছে। মাত্রা স্থাপনগত নিয়মের দ্বারা ঐ সকল রীতির লক্ষণ নির্দেশ করিতে পারা যায়।

লেখক যেজন্য ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এই, যে বাঙলা তিন রীতির ছন্দেই অক্ষরের সংকোচন প্রসারণ প্রয়োজনবশে করা যায়। আ, এ সচরাচর সর্বত্র একমাত্রার, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে কখনও কখনও ঐগুলি দুই মাত্রার ধরিতে হয়। এমন কি প্রয়োজন বশে অক্ষরবৃত্তেও (যৌগিক-মৌলিক যেখানে মোটামুটি ১ মাত্রার) উহাদের প্রসারণ চলে। ফলে মাত্রা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। কিন্তু লেখকের এরূপ অভিমত সমর্থনযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা দেখিতে পাই আধুনিক অক্ষরবৃত্তে সব অক্ষরই একমাত্রার। ঐরূপ অনিয়মিত প্রসারণ এত স্বল্প যে উহাকে ব্যতিক্রম বা ভুল বলিয়া গণনা করা উচিত। আর মাত্রাবৃত্তে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই (স্বরান্ত অথবা ব্যঞ্জনান্ত) দুই মাত্রার। ইহারও ব্যতিক্রম অধুনা অত্যন্ত স্বল্প, নগণ্য। কেবল শ্বাসাঘাতে শ্বাসঘাতের নিয়মে অক্ষরের মাত্রা পূর্বনির্দিষ্ট থাকে না। অনেক সময় পাঁচ অক্ষরের পর্বকে সংকুচিত করিয়া এবং তিন অক্ষরের পর্বকে একটি অক্ষরের প্রসারণ ঘটাইয়া চার অক্ষর ও মাত্রার পর্বে লইয়া আসিতে হয়। এ জন্য এই ছন্দকে শ্বাসমাত্রিক বলা যাইতে পারে।

লেখক মাত্রাস্থাপনের ঐ প্রকার সংকীর্ণ অনিয়ম দেখিয়াই মাত্রার দিক দিয়া ছন্দের নামকরণ করেন নাই; করিয়াছেন বিভিন্ন রীতির

আভ্যন্তরীণ এক উচ্চারণ প্রবৃত্তির দিক হইতে। ঐ সকল লক্ষণ ছন্দোবিচারে অনেকটা যথাযথ হইলেও উহা গাণিতিক ছন্দোবিচারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকিয়া যায়। আর মাত্রাস্থাপনরীতির দিক দিয়া যখন তিন রীতির ছন্দের পার্থক্য দেখানো যায় তখন ঐপ্রকার অনির্দেশ্য নামকরণ খুব যুক্তি সংগত বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। এ বিষয়ে ছন্দঃপ্রকরণে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। উহা দ্রষ্টব্য।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(ক) ঘর কৈনু : বাহির বা | হির কৈনু : ঘর।

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

পর কৈনু আপন আ | পন কৈনু : পর ॥

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ●

রাতি কৈনু : দিবস দি | বস কৈনু : রাতি।

বুঝিতে না : রিনু বন্ধু | তোমার পী : রীতি ॥

৮+৬ চতুর্দশ অক্ষর চরণের পয়ার। মধ্যযতি শব্দের মধ্যে পড়িতেছে, ইহাতে ক্ষতি নাই, কারণ ছন্দ শব্দের অর্থবহতাকে সব সময় মানিয়া চলে না।

(খ) (গিরিধারী) নাহি বাহুবল : তব
চাহ : বুঝাইতে | আমি : বলাধিক।
ক্ষত্রিয় : সমাজে | কথা বটে : সম্মান : সূচক
ছল নহি : আমি | অতি ছল : তুমি
মুক্তকণ্ঠে : করিহে : স্বীকার।

অমিত্রাক্ষরের উপর নির্ভরশীল চরণ-বিন্যাসে স্বাধীন "গৈরিশ" ছন্দ। এখানে পর্বগুলি ৬ ও ১০ মাত্রার। পর্বাঙ্গ প্রায়শঃ শব্দ-ভিত্তিক। সর্বত্র ১ অক্ষর = ১ মাত্রা।

(গ) সাত্ ভাই : চম্ পা | জা : গো
জাগো জাগো : মোর্ সাত | ভাই।
নিদাঘের : ভোরে শোন্ | ডাকিছে পা : রুল্ বোন্
অরণ্ণ মাঝে আর | রাত নাই।
চম্ পা গো চম্ পা গো | জাগো ভাই।

অষ্টমাত্রিক পর্বের ধ্বনিপ্রধান বা যৌগিক-দ্বিমাত্রিক ছন্দ। প্রথম চরণে একটি সপ্তমাত্রিক পর্ব এবং একটি চতুর্মাত্রিক অর্ধপর্ব গ্রথিত হইয়াছে।

১৯৫৬

১। বাঙলা পয়ার ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও গদ্যচ্ছন্দের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর :—ছন্দঃপ্রকরণে অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান ছন্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২। বাঙলা কোন্ জাতীয় ছন্দের কোনওরূপ শোষণ-শক্তি নাই? শোষণ-শক্তি না থাকিবার ফলে মাত্রার বিচার কিরূপ হইয়া থাকে?

উত্তর :—প্রথম প্রশ্নের উত্তর এবং ইহার উত্তর একত্র মিলিবে।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

(ক) চন্‌চল : চরণ ক | মলতলে : ঝংকরু

ভকতভ্র : মরগণ | ভোর।

পরিমলে : লুবধ সু | রাসুর : ধাবই

অহোনিশি : রহত অ | গোর ॥

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। আটমাত্রার পর্ব। পর্বাঙ্গ চার মাত্রার। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ পর্ব অপূর্ণ। আ, ও প্রভৃতি মৌলিক স্বরের অধিক দীর্ঘীকরণের জন্য কেহ কেহ ইহাকে "প্রত্নমাত্রাবৃত্ত" নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক মাত্রাবৃত্ত হইতে উহা যেহেতু উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য বহন করে না সেজন্য আমরা সাধারণ মাত্রাবৃত্ত (যৌগিক-দ্বিমাত্রিক) বা ধ্বনিপ্রধান নামই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

(খ) কে নারী অঙ : গনে এল | চিনিতে না : পারি।

অঙগনে দাঁ : ড়াইয়ে এ | নয় আমার প্রাণ্‌কুমারী।

দশ দিক : দীপ্ত করা | এ রমণী : দশকরা

বিবিধ আ : যুধ ধরা | দনুজ দ : লনী হেরি ॥

অষ্টমাত্রিক পর্বের অক্ষরমাত্রিক (তানপ্রধান) ছন্দ। ৮+৮ ষোল মাত্রায় চরণ। প্রথম চরণটি অবশ্য ৮+৬। কয়েকটি ক্ষেত্রে ছন্দের ত্রুটি থাকায় সংকোচন করিয়া পর্বের মাত্রা সংখ্যা ঠিক রাখিতে হইয়াছে।

(গ) ঢং ঢং ঃ ওং কৈ | লাসচূড়া ঃ ক্রাং ক্রাং

হিমজটা ঃ বিগলিত | গঙগায়াং ঃ সিঞ্চিয়াং

হর হর ঃ হর খর | গোমুখী ঃ প্রপাতে

ভেসে আসা ঃ পারিজাত | পরে উমা ঃ খোঁপাতে

৮+৭ বিভাগের পনের মাত্রার চরণের ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যৌগিক অক্ষর হইলেও চরণের শেষে অবস্থিত বলিয়া 'ক্রাং' ও 'য়াং' দুই মাত্রার মূল্য না পাইতে পারে, কিন্তু শব্দ মধ্যবর্তী 'গঙ্' এই যৌগিকের অবশ্য দুই মাত্রার মূল্য থাকা উচিত। এক্ষেত্রে "গঙ্গায়াং" স্থলে 'গঙায়াং' এরূপ পাঠ করিলে ব্যতিক্রম হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

১৯৫৭

১। বাঙলা কবিতার ছন্দকে তিনটি বৃত্তে ভাগ না করিয়া তিন ঢঙের বলিয়া বর্ণনা করার সার্থকতা কি?

উত্তর ঃ—বাঙলা ছন্দের নিয়ন্ত্রী শক্তি হইল উহার যতি এবং তদনুযায়ী পর্ববিভাগ। এই দিক হইতে অক্ষরমাত্রিক, মাত্রাবৃত্ত এবং

শ্বাসমাত্রিক একই জাতির। তবে উচ্চারণ রীতির পার্থক্য হিসাবে তিন প্রকার ভিন্ন রীতির বা ঢঙের ছন্দের নাম করা হইয়াছে মাত্র। যেমন, যে রীতির ছন্দে বিশেষ একটি টানের বা তানের প্রভাবে সকল অক্ষর (মৌলিক এবং যৌগিক) লঘু হয় বা এক মাত্রার মূল্য লাভ করে তাহা তানপ্রধান ঢঙের ছন্দ। যে রীতির ছন্দে প্রত্যেক ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে স্বতন্ত্র মূল্য দিয়া পৃথক্ ভাবে উচ্চারণ করা যায় এবং তাহাতে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই গুরু বা দীর্ঘ হয় তাহা ধ্বনিপ্রধান ঢঙের ছন্দ। আর যে রীতির ছন্দে একটি প্রবল শ্বাসপতন বা ঝোঁক পর্বের দীর্ঘতা চার মাত্রার করিয়া তুলে তাহা শ্বাসাঘাত রীতির ছন্দ। বস্তুতঃ তিন রীতির ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পর্বাত্মক উচ্চারণ হইলেও অন্যবিধ স্ফুট পার্থক্যের দিক হইতেই রীতিগত তিনটি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা সমীচীন সন্দেহ নাই।

এ বিষয়ে অবশ্য আমরা আর একটি কথা যোগ দিতে পারি। তাহা এই যে তিন রীতির মধ্যে পার্থক্য শুধু উচ্চারণগতই নহে মাত্রাগতও। এই হিসাবে তানপ্রধান অক্ষরমাত্রিক (১ অক্ষর = ১ মাত্রা) ধ্বনিপ্রধান যৌগিক-দ্বিমাত্রিক এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান (শ্বাস-মাত্রিক) যাহার পর্ব সর্বদা চতুর্মাত্রিক।

২। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' এবং 'পলাতকা' কাব্যের ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর :—ছন্দঃপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

|| ০ ||০ ০০ ০০০ ০ || ০

(ক) কুন্দ বল্লী তরু | ধরলনি : শান।

‖ ● ● ‖ ০ ০ ● ০ ●● ‖ ০
পাটল : তূণ অ | শোকদল : বাণ ॥

‖ ০ ● ০ ‖০ ● ০ ● ০ ‖ ০
কিংশুক : লবঙ্‌গ | লতা একঃ সঙ্‌গ ।

‖ ০ ● ০ ০ ০ ● ০ ০ ০ ● ‖ ০
হেরিশিঃ শিররিতু | আগে দিল ; ভঙ্‌গ ॥

অষ্টমাত্রিক পর্বের ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। চার চার মাত্রায় পর্বাঙ্গ। আ, এ প্রভৃতি মৌলিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ প্রয়োজনবশে।

´০ ● ০ ০ ´০ ০ ০০
(খ) প্রাণ প্র : ণ্‌বের্‌ | দ্রষ্‌টা : নব।

´০ ● ০ ০ ´০ ০ ০০
গান্‌ সে : অস | পত্‌ন তব

০ ◡ ●০ ‖ ০০ ‖´ ‖
অমৃতস : মুদ্‌ভব | জয় জয়

´০০ ০ ০ ০´ ০ ০০
যুবন্‌ : প্রাণের্‌ | গাও আ : রতি

০ ´● ০ ● ০০´ ০ ●
যে প্রাণ্‌ : বনে | বনস্‌ : পতি

● ´০ ০০ ● ০ ● ০ ´‖ ‖
নবীন্‌ সব : নের ব্রতী | জয় জয়

সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক বৈদিক ছন্দ অনুকরণের প্রয়াস। বাঙ্‌লা উচ্চারণে তাই নানান্‌ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম দুইটি চরণ যদিই ছড়ার ছন্দে গ্রথিত করা যায়, তৃতীয় চরণটি হইয়া পড়ে মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার

মিশ্রণ। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ ঐরূপ ছড়ায় গ্রথিত করা গেলেও পঞ্চম চরণে উহা দ্বিতীয় পর্বে একটু শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে।

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ०

(গ) বাজ্ঃছে ঃ শূন্ঃন্যে | অব্ঃভ্র ঃ কম্বু

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ०

কাঁপ্ঃছে অম্ঃবর্ | কাঁপ ছে ঃ অম্ঃবু

॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ०

লক্ ঃ খঃ ঝর্ঃণায় | উঠঃছে ঃ ঝংকার্

॥ ० ॥ ॥ ॥ ० ॥ ०

ওম্ স্ব ঃ য়ম্ ঃ ভূ | ওম্ স্ব ঃ য়ম্ ভূ

আট ও সাত মাত্রার পর্বের ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। বৈশিষ্ট্য এই যে অভিপ্রেত অর্থের ব্যঞ্জনার জন্য কবি বহুস্থানে এক একটি পর্বাঙ্গে এক-একটি অক্ষর (syllable) বিন্যস্ত করিয়াছেন। কখনও কখনও মৌলিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণও করিয়াছেন। ইহাকে প্রতি অক্ষর নির্বিচারে ১ মাত্রা ধরিয়া ছড়ার ছন্দে রূপান্তরিত করা উচিত হইবে না।

১৯৫৮

সাধারণ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ছন্দঃপ্রকরণ দেখিলেই চলিবে। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর ঃ—

॥ ० ० ॥ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

(ক) কনূটক ঃ গাড়িক | মলসম ঃ পদতল

॥ ० ० ॥ ० ० ॥ ०

মনূজীর ঃ চীরহি | ঝাঁপি।

॥ ० ० ॥ ० ० ॥ ० ० ॥ ० ०

গাগরি ঃ বারিঢা | রী করি ঃ পীছল

० ० ० ० ॥ ० ० ॥ ०

চলতহি ঃ অঙ গুলি | চাপি।

অষ্টমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। চারমাত্রায় পর্বাঙ্গ। চতুর্থ ও দ্বিতীয় চরণের শেষ পর্ব অপূর্ণাক্ষর।

o o o o o o o o oo o o o o o o oo

(খ) শ্রাবণের : বৃষ্টিধারা | শরতের : শিশিরের : কণা

o oo o oo o o o o

প্রাণের : প্রথম : অভ্যর্থনা

o o o o

জন্ম : সেই

o o o o o o

এক : নিমেষেই

o o o o o o

অন্তহীন : দান

অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির চরণ-বিন্যাসে স্বাধীন বলাকা-জাতীয় ছন্দ। প্রথম চরণে ৮ + ১০ অক্ষর ও মাত্রা, তৃতীয় চরণে একটি পর্বাঙ্গ অথবা তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ মিলাইয়া দশ মাত্রার একটি পূর্ণ পর্ব। পঞ্চম পর্বে ছয় মাত্রা।

‖ o o oo ‖ o o

(গ) (আহা) ঠুক্‌রি : য়ে মধু | কুল্‌কু : লি

= o o o o o ‖ o o

উড়ে চ : লেগেছে | বুল্‌ বু : লি

‖ o o o o o o o o o o

টুল্‌টু : লে তাজা | ফলের : নিটোলে

‖ o o o o ‖ o o

টাট্‌কা : ফুটিয়ে | ঘুল্‌ঘু : লি

ষণ্মাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। প্রতি জোড় চরণের শেষপর্ব অপূর্ণাক্ষর।

১৯৫৯

ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

‖ ০ ‖ ০ ০ ‖ ০ ● ০০০
(ক) শীত : আতপ | বাত : বরিখন
০ ০ ০ ‖ ●০ ‖ ০ ●
এ দিন : যামিনী | জাগি : রে।
০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০০০ ●০০০
বিফলে : সেবিনু | কৃপণ : দুরজন
●০ ০ ০ ০০০ ‖ ● ০
চপল : সুখলব | লাগি : রে ॥

সপ্তমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত। পর্বাঙ্গ ৩+৪ মাত্রার।

০ ●● ০ ০ ০ ● ০ ০ ০ ০ ০
(খ) প্রভুবুধ্ : ধ লাগি | আমি ভিক্ : খা মাগি
০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ● ● ০ ০
ওগো পু : রবাসী | কে রয়ে : ছ জাগি
● ● ০ ০ ০ ০ ০ ০ ● ● ●●
অনাথ : পিণ্ডদ | কহিলা : অম্বুদ
০ ০ ●
নিনাদে।

ষণ্মাত্রিক পর্বের অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান ছন্দ। স্তবকের অর্ধাংশ। ১২ অক্ষরে চরণ, শেষ চরণ শুধু একটি পর্বাঙ্গে।

(গ) নিশার : স্বপন : সম | তোর এ : বারতা
রে দূত ** অমরবৃন্দ | যার : ভুজবলে
কাতর * সে ধনুর্ধরে | রাঘব : ভিখারী
বধিল : সম্মুখ : রণে ** | ফুলদল : দিয়া
কাটিলা কি : বিধাতা : শাল্ | মলী তরুবরে **)

মধুসূদনীয় অনিয়মিতছেদ যুক্ত "অমিত্রাক্ষর" ছন্দ। দাঁড়ি চিহ্ন যতির, তারকাচিহ্ন অর্ধচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের। শেষ পঙক্তিতে মধ্যযতি অনিবার্যভাবে শব্দের মধ্যে পতিত হইয়াছে। মৌলিক যৌগিক সকল অক্ষর একমাত্রায়। শব্দের শেষের হলন্ত ব্যঞ্জন অক্ষরটিকে অকারান্ত ধরিয়া ১ + ১ মাত্রা।

ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর ঃ—

‖ o o ‖ o o •o •• ‖ ••
(ক) চম্‌পক ঃ শোণ কু | সুমকন ঃ কাচল
• o o ‖ o o • ‖ •o o
জিতল গৌরতনু | লাবণি ঃ রে।
‖oo ‖ ‖ • • o • o o oo
উন্‌নত ঃ গীম | সীম নাহি ঃ অনুভব
•o o o ‖ oo ‖ • o o
জগ মনো ঃ মোহন | ভাঙনি ঃ রে॥

অষ্টমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের পর্ব অপূর্ণমাত্রিক। তৃতীয় চরণের প্রথম পর্বের শেষে প্রয়োজনবশে মৌলিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ লক্ষণীয় ঘটনা।

´o o • o • o´ • • ´o• o o o •
(খ) নন্‌দী ঃ বলে | আমার ঃ শম্ভু | যেন ঃ রজত্ | গিরি।
´• o o o ´o o o • o´o oo oo
জয়া ঃ বলে | গৌরী আমার্ | সুবর্ ঃ ণবল | লরী,
oo´ • o
(রূপে) জগৎ ঃ আলো।

শ্বাসাঘাতপ্রধান বা শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। নিয়ত চার মাত্রার পর্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষ পর্ব অপূর্ণাক্ষর।

(গ) পুরাতন : বৎসরের | জীর্ণ ক্লান্ত : রাত্রি
ওই কেটে : গেল ওরে | যাত্রী
তোমার : পথের পরে তপ্ত রৌদ্র : এনেছে : আহ্বান
রুদ্রের : ভৈরব : গান।

অক্ষরমাত্রিক রীতির চরণ বিন্যাস বিষয়ে স্বাধীন বলাকায় দৃষ্ট ছন্দঃ পদ্ধতি। প্রথম চরণ ৮+৬ অক্ষর ও মাত্রার, দ্বিতীয় চরণ ৮+২ এর, তৃতীয় ১০+৮ এর এবং চতুর্থ ৮ অক্ষরের।

১। সংস্কৃত ছন্দকে বাঙলা ভাষায় কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে?

উত্তর :—ছন্দঃ প্রকরণে এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য। ইহা ব্যতীত ১৯৪৪ সালের প্রশ্নোত্তরও দ্রষ্টব্য।

২। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পরবর্তী গদ্য ছন্দের প্রাক্-রূপ বলা যাইতে পারে কি?

উত্তর :—না, পারে না। কারণ, গদ্যচ্ছন্দ ইংরাজি Free verse-এর আদর্শে এবং বাঙ্লা রূপকথা ঢঙের গদ্যের সারূপ্যে গঠিত। অমিত্রচ্ছন্দকে Free verse বা গদ্যচ্ছন্দ বলা যায় না। কারণ, ইহা

পয়ারের ৮+৬ মাত্রায় পর্ববিন্যাসের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। গদ্যচ্ছন্দে যেমন পর্ববিন্যাস স্বাধীন (অর্থাৎ ভাবানুযায়ী চরণে যে-কোনও সংখ্যক অক্ষরের পর্ব দেওয়া যাইতে পারে) অমিত্রচ্ছন্দে সেরূপ নহে। অমিত্রচ্ছন্দের মিলহীনতা এবং ছেদস্থাপনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ মুক্তচ্ছন্দ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। (এ বিষয়ে ছন্দঃ প্রকরণের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০
(ক) থীর : বিজুরি | বরণ : গোরী

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
পেখনু : ঘাটের | কূলে।

০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কানড় : ছান্দে | কবরী : বান্ধে

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
নবমল্লিকার | মালে।

ছয়মাত্রার পর্বের মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ। চতুর্থ পঙক্তির নিম্নরেখ 'মল্' এই যৌগিক অক্ষরের লঘুতা ছন্দোনিয়মের ব্যতিক্রম।

(খ) বিরস : বদন : এবে | কৈলাস : সদনে
গিরিশ * * বিষাদে : ঘন | নিশ্বাসি : ধূর্জটি
হৈমবতী : পানে : চাহি | কহিলা * : হে দেবি *
পূর্ণ : মনোরথ : তব | হত : রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ : কাল-রণে | * *

অক্ষরমাত্রিক রীতি "অমিত্রাক্ষর" ছন্দ | দাঁড়ি চিহ্ন যতির এবং তারকা চিহ্ন অর্ধযতি ও পূর্ণযতির।

(গ) নীল নীল

সবুজের ছোঁয়া কিনা | তা বুঝি না

ফিকে গাঢ় হরেক রকম

কম বেশি নীল।

তার মাঝে | শূন্যের আন্‌মনা হাসির সামিল

কটা গাঙ্‌চিল

দৃশ্যতঃ অক্ষরমাত্রিক গদ্যচ্ছন্দ। প্রতিচরণে পর্বশেষ। পঞ্চম চরণে ১৩ অক্ষরের একটি দীর্ঘ পর্ব। কিন্তু এটি স্বচ্ছন্দে সমিল যৌগিক দ্বিমাত্রিক ছন্দেও পাঠ করা যায়। যেমন—

নীল নীল।

সবুজের ছোঁয়া কিনা ¦

তা বুঝিনা—ইত্যাদি

এরূপ অবস্থায় এটিকে শুদ্ধ গদ্যচ্ছন্দ বলা যাইবে না। মিলহীন হইলেও নয়।

১। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রাচীন রীতি ও রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী কবিগণ অনুসৃত আধুনিক রীতির মধ্যে মুখ্য পার্থক্য কি ?

উত্তর :—এরূপ পার্থক্য কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে গুরুতর পার্থক্য কিছু নাই। ব্যাপারটি এই যে, পূর্বতন মাত্রাবৃত্ত (যেমন বলা যাইতে পারে বৈষ্ণব ব্রজবুলি পদের ছন্দ) অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্তের খুব কাছাকাছি ছিল বলিয়া (যেহেতু অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্তই ব্রজবুলি এবং পরে বাঙ্‌লায় প্রবেশলাভ করিয়াছে) আ, ঈ, উ, এ

প্রভৃতি মৌলিক (পূর্বতন) দীর্ঘ স্বরের বা স্বরযুক্ত অক্ষরের দুই মাত্রা উচ্চারণ ইহাতে বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে, যদিও সর্বত্র নয়। যেমন ধরা যাক নিম্নলিখিত পদাংশটি—

০ ০ ০০ ০০০ ০ ॥ ০০ ॥ ০ ০
সুনয়নী কহত কা | হু ঘন শ্যামর
॥ ০ ০০০ ০০ ॥ ০
মোহে বিজুরি সম | লাগি।
০ ০ ০০ ॥ ০ ০ ০০ ০ ০ ॥ ০ ০
রসবতী তাক প | রশ রসে ভাসত
১ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ॥ ০
হমারি হৃদয়ে জলু | আগি ॥

এই দৃষ্টান্তে কয়েকটি আ, উ, ও দীর্ঘ বা দুই মাত্রার হইয়াছে, আবার কয়েকটি হয় নাই। প্রয়োজনবশেই এরূপ হইয়াছে। আধুনিক মাত্রাবৃত্তেরও ইহাই নিয়ম, যদিও আ, এ প্রভৃতির দীর্ঘীকরণ পূর্বাপেক্ষা কম। কিন্তু কম-বেশির পার্থক্যে আভ্যন্তরীণ কোনও গুরুতর পার্থক্য হয় না। এবং সেজন্য আখ্যার পরিবর্তনও (প্রত্ন-মাত্রাবৃত্ত) অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। যেমন, ধরা যাক নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি—

॥
স্নেহ অঞ্চলে মুছায় আঁখিজল
ব্যথিত মস্তকে চুম্বে অবিরল
যতনে লয় তুলি যাতনা তাপ ভুলি,
॥
বদন পানে চেয়ে থাকিরে।

এখানে ছন্দের প্রয়োজন বশে দুইমাত্রা চিহ্নিত অংশগুলি দীর্ঘ হইয়াছে। অথচ কবিতাটির ছন্দ যে প্রাচীন এবং এখন প্রায় অচল এমন কথা বলিবার উপায় নাই। যাহাই হোক, এটুকু বলা যায় যে প্রাচীন মাত্রাবৃত্তে মৌলিক আ, ঈ প্রভৃতি অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বেশি, আধুনিকে স্বল্প।

১। কেহ বলেন যে বাঙ্‌লা ছন্দের মূল প্রকৃতি একটি, সেই এক মূলপ্রকৃতির ভিতরে বিভিন্ন ঢঙ্ মাত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্ত সহকারে এই মতটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর :—প্রত্যেক ভাষাগত জাতির ছন্দ সেই ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ প্রবণতার উপর নির্ভর করে। যে-কোন ভাষার উচ্চারণের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ প্রধান হইয়া দেখা দেয়। যেমন বলা যাইতে পারে ইংরেজির accent প্রবণতা, সংস্কৃতের লঘু-গুরু ভঙ্গি, বাঙ্‌লার যতি। বাঙ্‌লা গদ্যের পাঠে এবং কথাবার্তা বলার সময় আমরা এক এক ঝোঁকে কয়েকটি করিয়া শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করি এবং তারপরই একটু থামি। ইহাই যতি এবং দুই যতির দ্বারা বিভক্ত অংশকে পর্ব বলা হইয়াছে। আমাদের বাক্যের উচ্চারণে এক বা একাধিক পর্ব বিভাগ থাকে।

আমাদের ছন্দও এই যতি ও পর্ব-বিভাগের দ্বারা নিয়মিত। সাধারণ গদ্যে যতিপাত বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে। ৩, ৪, ৫ হইতে ১০, ১২, ১৩ পর্যন্ত অক্ষরের পর যতি গদ্যপাঠে আমরা দিয়া থাকি; কবিতার ছন্দে এই যতিপাতের একটি শৃঙ্খলাত্মক বিধান থাকে। এক এক প্রকারের ছন্দে এক একটি প্যাটার্ন্ ধরিয়া যতি ও পর্বের বিন্যাস করা হয়, যেমন ৬+৬, ৮+৬, ৮+১০, ৮+৮+১০, ৬+৬+৮,

৫+৫+৫+২, ৪+৪+৪+২ ইত্যাদি অক্ষর বা মাত্রার বিভাগে যতি দেওয়া হয়।

অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান, মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধানএবং শ্বাসমাত্রিক বা শ্বাসাঘাতপ্রধান এই তিন রীতিতেই পর্ববিন্যাসই বাঙ্‌লা ছন্দের ঐক্যের বিষয়। উচ্চারণ এবং মাত্রাস্থাপন ভঙ্গির পার্থক্যের জন্য ঐ তিনরীতির পার্থক্য। এইজন্য কেহ কেহ ঐ তিন প্রকার ভিন্ন জাতির ছন্দ স্বীকার করেন না। বলেন জাতি একই, উচ্চারণগত (এবং মাত্রাগত) পার্থক্যের জন্য ভিন্ন জাতি ধরার আবশ্যকতা নাই, ঢঙ বলিলেই চলিবে।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

(/০) পূর্বে দ্রষ্টব্য

(৵০) কোনো : দূর : যুগান্তরে | বসন্ত কাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার সুখে | একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

অক্ষরমাত্রিক ছন্দ পয়ারের ৮+৬ পর্বের ভগ্ন রূপান্তর। পঞ্চম পার্বে শুধু ১০ মাত্রায় পর্ব ধরা যায়। এই হিসাবে বলাকায় দৃষ্টচরণ বিন্যাসের স্বাধীন অক্ষরমাত্রিক ছন্দও বলা যায়। এক অক্ষর = ১ মাত্রা, চরণ শেষে যতির চিহ্ন দেওয়া হইল না।

‖ ০ ০০০ ০০● ●●০ ০০০ ‖ ০ ●০০ ০●

(৩/) বৈশা : খীশেম | নিরেট : গরম | আষাঢ় : বৃষ্টি | ধারার : গান

০০০ ‖ ০ ‖ ০ ●০০ ‖●০‖ ‖●০

কবে যে : ধর্‌বে | উল্লা : সে বঁধু | বৃষ্টিভিরুদ্‌ | বেজিতা

● ‖ ●০০ ০০০ ০ ০● ‖ ০ ‖ ০ ‖ ● ০

বৃহন্‌ : নল্লার | পাপহ : বে ক্ষয় | পার্থ : সার | নির্‌ঘোষে

●●০ ‖ ০ ০০০ ০০০ ০০‖ ০● ‖ ০০০

নামাবে : বর্‌ষা | মাটির : হরিষে | পুরবৈঞাায় | নিন্দ যাই।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। ষণ্মাত্রিক পর্ব। শেষ পর্ব অপূর্ণাক্ষর এবং উহাতে চরণগত মাত্রারও সমতা নাই।

১। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের প্রতিপর্বে মাত্রাসংখ্যা ৪ নহে, ৪½। এই মতটির পক্ষে এবং বিপক্ষে কি বলিবার আছে ?

উত্তর :—সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার ‘ছন্দঃসরস্বতী’ নামক আলোচনায় এই রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ধারণায় বাঙ্‌লা যৌগিক অক্ষরগুলি যেমন, এই, ঐ, নয়, দেখ, জল্‌, বন্‌, গুণ প্রভৃতির মূল্য একমাত্রার অধিক, অথচ সংস্কৃত গুরু অক্ষরের মাপ হইতে কম। ধরা যায় ১½। ছড়ার ছন্দে পর্ববিভাগ করিয়া অক্ষরের মাত্রা বসাইতে অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। পর্ব সর্বত্র চার অক্ষরের না হইয়া কখনও কখনও তিন অক্ষরেরও হইয়া থাকে। যেমন, আয় আয় সই | জল আনিগে | জল আনিগে | চল্‌—এখানে প্রথম পর্বে যৌগিক অক্ষর তিনটি, আর দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বে যৌগিক মৌলিক মিশাইয়া অক্ষর

চারটি। যেহেতু মৌলিকের মাত্রা-মাপ যৌগিকের সঙ্গে তুলনীয় হয় না সেই হেতু মৌলিক অক্ষর = ১ এবং যৌগিক অক্ষর = ১½ ধরিলে সব পর্বেই একপ্রকার মাত্রা মিলিয়া যায় ১½ + ১½ + ১½ | ১½ + ১ + ১ + ১ | ১½ + ১ + ১ + ১। এইরূপ আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত হইতে গাণিতিকভাবে তিনি ৪½ মাত্রায় হিসাব ধরিয়াছেন।

যৌগিক অক্ষর দেড়মাত্রা এবং মৌলিক অক্ষর একমাত্রা ধরিলে কিরূপ মাত্রাধিক্য অথবা মাত্রার স্বল্পতা হয় তাহা দেখানো যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কবিতা হইতেই দেখা যাক—

আজকে তোমায় | দেখতে এলেম্ | জগৎ আলো | নূর্‌জাহান্ |

ইহার প্রথম পর্বে ৫, দ্বিতীয় পর্বে ৫, তৃতীয় পর্বে ৪½ এবং চতুর্থ পর্বে ৪ মাত্রা ঐ গণনায় পাওয়া যাইতেছে। অথচ কবিতা পাঠে যাঁহার একটু কান আছে তিনিই বলিবেন পর্বগুলি এক মাপের অর্থাৎ সম কালপরিমাণে বাঁধা। মূল ছড়া হইতে দেখা যাক্—

যমুনাবতী | সরসৃসতী | কাল যমুনার | বিয়ে

ঐ হিসাবে এখানেও প্রথম পর্বে ৫, দ্বিতীয়ে ৪½, তৃতীয়ে ৫। এরূপ স্থলে কি হইবে?—

তাই তাই | তাই
নাই নাই | নাই

এখানে কি ১½ + ১½ মাত্রার পর্ব ধরিব? ফলে দেখা যায়, ঐ হিসাবে ছন্দের মাপ পাওয়া যায় না। আসল কথা বাঙ্‌লা ছন্দে মৌলিক যৌগিক সমস্ত অক্ষর মূলতঃ ১ মাত্রার। একমাত্র মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে যৌগিক মাত্রেই ২ মাত্রার। শ্বাসাঘাত ছন্দে শ্বাস অনুযায়ী মাত্রা, যাহার জন্য কোথাও দীর্ঘীকরণ, কোথাও হ্রস্বীকরণ

করিয়া পর্বের সাম্য রক্ষা করিলে তবেই ছন্দ টিঁকে। তা ছাড়া ১½ বলিয়া কোনও ভগ্নাংশের মাত্রা ধরাও যুক্তিসংগত নয়। মৌলিক যৌগিক কোনো অক্ষরের উচ্চারণেই আমাদের সময়ের পার্থক্য হয় না। ব্যক্তিবিশেষে যদি কোনো ব্যতিক্রম থাকে তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অতএব শ্বাসমাত্রিক ছন্দে পর্বের পরিমাণ সর্বত্র ৪ মাত্রার। অক্ষর বেশি থাকিলে সংকুচিত করিয়া এবং অক্ষর কম থাকিলে মাত্রায় বর্ধিত করিয়া এই চার মাত্রার পূরণ করিতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ যৌগিক অক্ষরকে ১½ মাত্রা ধরিতে চাহিয়াছেন। কেহ যদি বলেন ১⅓ তাঁহাকে নিরস্ত করা যায় কিভাবে?

২। তানপ্রধান ছন্দের শোষণ-শক্তি বলিতে কী বুঝায়?—ইত্যাদি।

উত্তর :—ছন্দঃপ্রকরণে ঐ অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

০ ০ ০ ০   ০০ ০০   ।। ০ ০ ০ ০ ০ ০

(/) মণি-অভ : রণ কত | অঙ্গহি : ঝলকত

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০   ০ ০

নাসায় মু : কুতা কিবা | দোলে।

॥ ॥ ॥   ॥ ০ ০ ০ ০ ০০

মা মা : মা বলি | চান্দব : দন তুলি

০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

নবীন কোকিল যেন | বোলে॥

অষ্টমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

‖ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(৭/০) স্নেহ : বিহ্বল | করুণা : ছলছল |

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০

শিয়রে জাগে কার | আঁখি রে

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০

মিটিল : সব ক্ষুধা | সন্‌জী : বনী সুধা |

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০

এনেছে : অশরণ | লাগি রে

সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। শেষ পর্ব অপূর্ণাক্ষর।

০ ০ / ০ ০ ০ / ০ ০ ০ ০ / ০

(১/০) গলির : মোড়ে | বেলা যে : পড়ে | এলো

০ ০ / ০ ০ ০ ০ / ০ ০ ০ / ০

পুরাণো : সুর | ফেরি : ওয়ালা | ডাকে

০ ০ / ০ ০ ০ / ০ ০ ০ ০ / ০

দূরে : বেতার | বিছায় : কোন | মায়া

০ / ০ ০ ০ ০ ০ / ০ ০ /

গ্যাসের : আলো | জ্বালা : এ দিন্ | শেষে

শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। নিয়ত চতুর্মাত্রিক পর্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে সংকোচন। 'বেলা যে' স্থানে পাঠ "বেল্ যে", 'ওয়ালা' স্থানে পাঠ 'ওলা'।

অলংকার

(অলংকারের লক্ষণ ও উদাহরণের জন্য অলংকার-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

১৯৫৪

অলংকার নির্ণয় কর :—

(ক) "সেই অপদার্থ চায়" ইত্যাদি। উপমানবস্তু (বামন) এবং উপমেয় বস্তু (অপদার্থ) ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত একই সমানধর্মের

দ্বারা (ধরিবারে চাওয়া এবং লভিবারে চাওয়া) যোজিত হওয়ায় **প্রতিবস্তূপমা**।

(খ) "পরশমণির সাথে" ইত্যাদি। স্পষ্টত: **ব্যতিরেক**। স্পর্শমাণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গের গুণাধিক্য। কাব্যলিঙ্গের সঙ্গে সংকর।

(গ) "সরসীর" ইত্যাদি **উৎপ্রেক্ষা**। যেন শব্দে পরিস্ফুট বলিয়া **বাচ্য**। উপমেয়—স্বচ্ছ জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব। ইহা কবিকল্পনায় চন্দ্রের দর্পণে মুখ দর্শনের সহিত সম্ভাবিত। **সমাসোক্তির** সঙ্গে সংকর।

(ঘ) "কণ্টক সম" ইত্যাদি। কুসুমের কণ্টকে রূপান্তর এবং শশীর অনল-বর্ষণ এই দুই বিষয়ে কারণ ও কার্যের গুণবিরোধ। অতএব **বিষম** অলংকার।

১৯৫৫

(ক) "সংসার-সাগর বক্ষে" ইত্যাদি। সংসার এবং সাগর এই দুই অভেদারোপিত উপমেয় উপমানের বিভিন্ন অঙ্গ, যথা কামনা এবং ঢেউ, চিত্ত এবং তরী, এইগুলিও অভেদে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া **সাঙ্গরূপক** অলংকার।

(খ) "মেঘ আপনারে" ইত্যাদি। উপমেয় এবং উপমান মেঘ ও সাধু, একই সমানধর্মের দ্বারা যোজিত হইয়া (নিঃস্ব করিয়া ঢালা এবং মঙ্গল করা) **প্রতিবস্তূপমা** অলংকার ঘটাইয়াছে।

(গ) "তৃণ ক্ষুদ্র অতি" ইত্যাদি। বসুমতীর উপর জননীর ব্যবহার সমারোপিত হওয়ায় **সমাসোক্তি**।

(ঘ) "অভ্রভেদী চূড়া" ইত্যাদি। প্রথমাংশে **সমাসোক্তি**। দ্বিতীয়াংশ সহ **উৎপ্রেক্ষা**। গিরিবরের সহিত যোগীশ্বরের সম্ভাবনা অর্থাৎ গিরিবরকে প্রায় ত্যাগ করিয়া যোগীশ্বর পক্ষে প্রবল সংশয় সৃষ্টি।

১৯৫৬

(ক) "বন্ধন চাহে না" ইত্যাদি। 'মুক্তি চাওয়া' রূপ প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও কেহ মুক্তি পাইতেছে না বন্ধনই চাহিতেছে এরূপ বর্ণিত হওয়ায় বিশেষোক্তি। বিশেষ এই যে ইহা ভুজ বন্ধন।

(খ) "পাণ্ডবের সখা" ইত্যাদি। এক বর্ণনীয় বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করায় **উল্লেখ** অলংকার।

(গ) "চাঁদের ছায়াটি" ইত্যাদি। **উৎপ্রেক্ষা**: চাঁদের ছায়াটি ইত্যাদি বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় দেববালার নিজ মুখ দেখা প্রভৃতিতে সম্ভাবিত। 'যেন' শব্দে **বাচ্য**।

১৯৫৭

(ক) "মুদিত আলোর" ইত্যাদি। আলোর সহিত কমল-কলিকার অভেদ আরোপ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার জন্য আঁধারের সহিত পর্ণপুটের অভেদ আরোপ ঘটাইতে হইয়াছে। অতএব **পরম্পরিত রূপক**। "উতরিতে যবে" ইত্যাদি বর্ণনায় উপরি-উক্ত রূপকটিই পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র। নবপ্রভাতের সহিত তীরের অভেদেও ঐ রূপকের সম্প্রসারণ।

(খ) "নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা" ইত্যাদি। **সমাসোক্তি**। বর্ণচ্ছটায় যাত্রীর ব্যবহার এবং মঞ্জীর-ধ্বনিতে শ্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার সমারোপ।

(গ) "সুকৃষক যেই হয়" ইত্যাদি। কালের সহিত কৃষকের তুলনা করিয়া কালের (উপমেয়ের) নিদারুণত্বের অর্থাৎ নিকৃষ্টত্বের দিক দিয়া উৎকর্ষ। অতএব **ব্যতিরেক**।

১৯৫৮

(ক) "স্থির দীপশিখা" ইত্যাদি। প্রথম তিন পঙ্‌ক্তিতে পরিস্ফুট **উপমা** (এক্ষেত্রে লুপ্তোপমা) চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে পদ্ম অপেক্ষা সুধা-হাস্যের (উপমেয়ের) উৎকর্ষের জন্য ব্যতিরেক।

(খ) "ধবল ধবলগিরি" ইত্যাদি। প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে শব্দালংকার **যমক**। আবার প্রথম দুই এবং পরবর্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপ **অতিশয়োক্তি**।

(গ) "অন্ধ মোহবন্ধ" ইত্যাদি। মোহ-বন্ধ এবং স্নেহ-কারাগার এই দুই স্থলে রূপক। "জাগ্রত প্রহরী" এই উপমানের উপমেয় নাই। অথচ অভেদ আরোপের ভাব স্পষ্ট। অতএব এখানে Suppressed metaphor, সব মিলিয়া পরম্পরিত রূপক। যেহেতু স্নেহের সহিত কারাগারের অভেদ আরোপ নিমিত্ত, মুক্তি, প্রহরী প্রভৃতির প্রচ্ছন্ন রূপকের প্রয়োজন হইয়াছে।

(ক) "এনেছিলে" ইত্যাদি। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই **বিরোধ**। প্রাণ মৃত্যুহীন হয় না। অথচ অর্থে উহার পর্যবসান এইরূপে যে আদর্শ-প্রেরণার মধ্যে প্রাণের অবিনশ্বরতা। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ঐ বিরোধেরই সম্প্রসারণ ঘটানো হইয়াছে। এখানেই আপাতবিরোধ, অর্থে পর্যবসান।

(খ) "গৃহহীন পলাতক" ইত্যাদি। **কাব্যলিঙ্গ** অলংকার। গৃহহীন পলাতকের সুখী হওয়ার কারণ পরবর্তী অংশে চারুতার সহিত বিবৃত। ব্যতিরেক হইতে পারে না। কারণ 'তুমি' ও 'আমি'র মধ্যে কোনও উপমা-সম্পর্ক নাই।

(গ) "এক অঙ্গে" ইত্যাদি। ইহা অধিক অলংকারের দৃষ্টান্তরূপে কোনও অলংকার গ্রন্থে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু 'নয়নে' না ধরার বিষয় বলায় অলংকার অধিক (আশ্রয় ও আশ্রিতের বর্ণনায় একের গুণাধিক্য) হইবে না। অতএব এখানে **অতিশয়োক্তি**।

(ক) "উন্মত্তা নগরী" ইত্যাদি। নগরীর উপর নারীর ব্যবহার সমারোপে **সমাসোক্তি**। আবার ধর্মের চিতা এবং উৎসব-দীপ এই এই দুই ক্ষেত্রে রূপক কার্যকারণ সম্পর্কে স্থাপিত হওয়ায় **পরম্পরিত রূপক**।

(ক) "জননী, তোমার" ইত্যাদি। **উৎপ্রেক্ষা**। চরণখানি অরুণ কিরণের সহিত সম্ভাবিত হইয়াছে।

(খ) "বাসনা যখন" ইত্যাদি। বাসনার উপর অত্যাচারীর ব্যবহার সমারোপিত অতএব **সমাসোক্তি**।

(গ) "বিদ্যুৎ-বহ্নির" ইত্যাদি। **রূপক** (নিরঙ্গ) ।

(ঘ) "ঝিল্লি যেমন" ইত্যাদি। ঝিল্লির উপর বৈরাগী বাউলের ব্যবহার সমারোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি।

(ক) "সেই প্রায় অন্ধকার" ইত্যাদি। **উপমা** পূর্ণোপমা, যেহেতু গৃহ উপমেয়, শ্মশান উপমান, ভয়ংকরতা সাধারণ ধর্ম এবং 'মত' এই সাধারণ ধর্ম-বাচক শব্দ।

(খ) 'কাদম্বিনী' ইত্যাদি। মরিয়া মরে নাই এই প্রমাণ করার মধ্যে বাহ্যতঃ বিরোধ, অর্থতঃ পর্যবসান, অতএব **বিরোধাভাস**।

(গ) "ভূতলে অতুল" ইত্যাদি। উপমা। **পূর্ণোপমা**, যেহেতু সভা ও রত্ন রাজি = মানস সরোবর ও কমলকুল, শোভে = বিকশিত। বাচক শব্দ 'যথা'।

(ঘ) প্রতীয়মানা **উৎপ্রেক্ষা**। আলোর প্রকাশ পার্বতীয় হাসির সহিত সম্ভাবিত।

অলংকার ও ছন্দ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

অলংকার

১৯৫১

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোনও চারিটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, মালোপমা, নিদর্শনা, বিরোধ, স্বভাবোক্তি।

২। নিম্নলিখিত যে-কোনও চারিটি উদ্ধৃতিতে কি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও :—

(ক) ফাঁকের মধ্য দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখির মত হুশ্ করে উড়ে পালায়।

(খ) অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

(গ) জড়তার পাষাণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।
দুর্গমাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।

(ঘ) সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্তা কি
স্মরিছে রে বার্তাকু!
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু।

(ঙ) সভাকবি—ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ!
অর্থের বড় টানাটানি।
নটরাজ—নইলে রাজদ্বারে আসবে কোন্ দুঃখে।

(চ) লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥

উত্তর

১। **উৎপ্রেক্ষা ঃ** কবির কল্পিত বর্ণনে যদি উপমেয় অপেক্ষা উপমানকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চিত্তে প্রবল আগ্রহ জন্মে তাহা হইলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। যেমন—

ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা,
হর কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে।

এখানে উপমেয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় ছত্রধর। কিন্তু বর্ণনা এমন ভাবে করা হইয়াছে যাহাতে দেহধারী অদগ্ধ কামদেব বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে আগ্রহ জন্মে।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার ঃ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

'যেন', 'মনে হয়', 'বুঝি' প্রভৃতি শব্দ যোগে উপমানে সংশয় পোষণ করিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

এইরূপ বিতর্কবাচক শব্দ না থাকিলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন-বর্ণা!

ব্যতিরেক ঃ উপমান ও উপমেয়ের তুলনা করিয়া একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দেশ করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে।
(খ) চন্দ্রে যবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

(ক) অংশে 'হেম' অপেক্ষা গৌরাঙ্গের দেহকান্তির উজ্জ্বলতা ব্যক্ত করা হইয়াছে। (খ) অংশে শ্লেষালংকারের সহায়তায় চন্দ্রাপেক্ষা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণাধিক্য ব্যঞ্জিত করা হইয়াছে।

অপহ্নুতি ঃ উপমেয়কে নিষেধ বা গোপন করিয়া উপমানকে প্রকাশ করিলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়।

(ক) বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা।
(খ) ও নহে আকাশ নীল নীরনিধি হয়;
ও নহে তারকাবলী নব ফেনচয়;
ও নহে শশাংক কুণ্ডলিত ফণিধর,
ও নহে কলংক তাহে শায়িত কেশব॥

এখানে (ক) অংশে বৃষ্টিরূপ প্রকৃত ব্যাপারকে গোপন করিয়া আকাশের ক্রন্দনকে সত্যরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। (খ) অংশে প্রকৃত আকাশকে নিষেধ করিয়া অপ্রকৃত সমুদ্রকে সত্য বলা হইয়াছে।

মালোপমা ঃ একটি উপমেয়কে অনেকগুলি উপমানের সহিত সদৃশ বলিয়া তুলনা করিলে মালোপমা অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) কুন্দেন্দুতুষারশুভ্রা দেবি ! সরস্বতি !
(খ) মলিন-বদনা দেবী ; হায় রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।

এখানে (ক) অংশে সরস্বতীকে কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও তুষার এই তিনটি উপমানের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। (খ) অংশে দেবী অর্থাৎ সীতাকে খনিমধ্যবর্তী সূর্যকান্তমণি এবং সমুদ্রতলবর্তী লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে।

নিদর্শনা ঃ উপমেয় বাক্য এবং উপমান বাক্য দুইটিকে একই ক্রিয়ার দ্বারা অন্বিত করিয়া সাদৃশ্য দেখানো হইলে নিদর্শনা অলংকার হয়। যথা—

অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমলকানন !

এখানে অবরেণ্যকে বরণ করাও যা আর শৈবালে কেলি করাও তাই—এই প্রকার তুলনা দুইটি বাক্যকে এক করার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিরোধ ঃ প্রকৃত বক্তব্য বিষয়ে বিরোধ না থাকিলেও আপাত বিরোধ দেখানো হইলে বিরোধ অলঙ্কার হয়। যথা—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

এখানে মৃত্যুহীন প্রাণের মৃত্যু কী প্রকারে হয়, ইহাই বাহ্য

বিরোধ, তাছাড়া মৃত্যুর দ্বারা দান করাই বা কীভাবে ঘটিতে পারে—এইসব বাহ্যবিরোধের সমাধান এই অর্থে যে দৈহিক মৃত্যু হইলেও তাঁহার আত্মশক্তি সকলের মধ্যে কার্য করিবে।

স্বভাবোক্তি: প্রকৃতি বা অন্য বিষয়ের সৌন্দর্য যথাযথ অথচ মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) ধীরে ধীরে শর্বরী হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের প্রত্যূষ গান,
বনচূড়া রঞ্জিল স্বর্ণলেখায়
পূর্ব দিগন্তের প্রান্তরেখায় ॥

(খ) নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি ॥
অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি।
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি ॥

২। (ক) উপমা অলঙ্কার। উপমেয় 'মনোযোগ'; উপমান 'বুনোপাখী' সাধারণ ধর্ম—'হুশ্ করিয়া উড়িয়া পালানো'; তুলনামূলক শব্দ 'মত'।

(খ) বিষম অলংকার। কারণ ও কার্যের মধ্যে বিরুদ্ধতা থাকিলে বিষম হয়। এখানে অমৃত-সমুদ্রে স্নান কারণ, আর গরল-পরিণাম কার্য—এই দুই বিরুদ্ধ বস্তু।

(গ) পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার। উপমেয় 'জড়তা' ও 'প্রথা' উপমান 'পাষাণ প্রাচীর' ও 'দৈত্য'। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে দুইটি ক্ষেত্রে অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় অভেদটি প্রথম অভেদের উপর নির্ভরশীল বলিয়া পরম্পরিত রূপক হইয়াছে।

(ঘ) প্রথম দুই ছত্রে 'যমক' অলঙ্কার। 'শ্যাম' প্রসঙ্গ স্মরণে শ্লেষের আভাস আছে। শেষ দুই ছত্রে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। বেগুনের নশ্বর দেহকে একেবারে কচি বুক বলা হইয়াছে।

(ঙ) শ্লেষ অলঙ্কার। 'অর্থ' শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(চ) অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। উপমেয় অশ্রুধারার পরিবর্তে উপমান মন্দাকিনী বসানো হইয়াছে।

১৯৫২

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোন চারিটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর—

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, বিষম, প্রতীপ, অপ্রস্তুত প্রশংসা।

২। নিম্নলিখিত যে-কোন দুইটি উদ্ধৃতিতে যে অলঙ্কার আছে তাহা যথাসম্ভব অল্প কথায় বিবৃত কর ঃ—

(ক) প্রীতি-মন্ত্রবলে
শান্ত কর বন্দী কর নিন্দা-সর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

(খ) এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

(গ) নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে এগ্‌জামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন্ দিকে যে গড়ায়।
অপাঠ্য সব পাঠ্য-কেতাব সামনে আছে খোলা ;
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা !

(ঘ) হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

উত্তর

১। **প্রতিবস্তূপমা** ঃ—যাহাদের সাধারণ ধর্ম সমান অথচ পৃথক বাক্যে উপস্থাপিত—এমন দুইটি বিষয়ের তুলনা করিলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) চারিদিকে সখীদল যত,
বিরসবদনা, মরি সুন্দরীর শোকে।
কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী।

(খ) দময়ন্তি তব গুণ মোহয়ে ভুবন
হরিলে যাহার বলে নৈষধের মন ।।
কৌমুদী সাগরজল করে আকর্ষণ
কি আর বিচিত্র তাহে বুঝেছি এখন ।।

এখানে প্রথমাংশে সুন্দরীর শোকে সখীদলের অবস্থাকে বসন্তের বিরহে বনস্থলীর অবস্থার সঙ্গে একই সমানধর্ম (বিরসবদনের ভাব) যুক্ত করিয়া তুলিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে দময়ন্তীর গুণে নলের

মন হরণ এবং চন্দ্রিকার গুণে **সমুদ্রের** আকর্ষণ একই সমানধর্মে (হরণ —আকর্ষণ) উপমিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত ঃ পৃথক্ বাক্যের অন্তর্গত দুইটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে অথচ তাহাদের সাধারণ ধর্ম এক না হইলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥

এখানে কোটালিয়া কর্তৃক সুন্দরকে প্রহার এবং চন্দ্রকর্তৃক রাহুকে গ্রাস সাদৃশ্যে উপমিত। সমান ধর্ম এক নয় (প্রহার-আহার), সুতরাং দৃষ্টান্ত।

সমাসোক্তি ঃ সমান কার্য, লিঙ্গ ও বিশেষণের সাহায্যে উপমেয়ে উপমানের ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। যথা—

(ক) বসুন্ধরা দিবসের কর্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

(খ) আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে ॥

এখানে (ক) অংশে বসুন্ধরার উপর নারীর ব্যবহার সমারোপ করা হইয়াছে এবং (খ) অংশে বঙ্গভূমির উপর রাজ্ঞীর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

বিষম : কারণ ও কার্যের বৈষম্য দেখা দিলে কিংবা বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ হইলে বিষম অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে আরব্ধের বৈফল্য, অনর্থের উৎপত্তি প্রভৃতি বিরূপ ঘটনা দেখা যায়। যথা—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

প্রতীপ : উপমানকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়। যথা—

নিবিড় কুন্তল সম মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা : অপ্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয় নয় এমন কোন বিষয় দ্বারা বর্ণনীয় পরিস্ফুট করিলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। যথা- —

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

এখানে নদীর এপার-ওপার নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট মানুষের কথা ব্যঞ্জিত করিতেছে.

২। (ক) পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার। নিন্দার সহিত সর্পের অভেদ স্থাপনের জন্য প্রীতির সহিত মন্ত্রের অভেদ স্থাপন করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় রূপকটির উপর প্রথম রূপকটি নির্ভরশীল।

(খ) আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে নিশ্চয় অলঙ্কার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 'বন-মর্মর' ও 'সাগর' উভয়ই কল্পিত—শান্ত মাধুর্য ও উদ্বেল জীবন-রসের দ্যোতক। উপমানের দ্বারা উপমেয়ের বর্ণনা করায় অতিশয়োক্তি ও অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে।

(গ) বিরোধ অলঙ্কার। 'অপাঠ্য' ও 'পাঠ্য-কেতাব'-এর মধ্যে আপাত অর্থের বিরোধ আছে মাত্র। প্রথম দুই পঙক্তিতে বিষম।

(ঘ) 'হাতের দান' অপেক্ষা হৃদয়ের দানের উৎকর্ষ বা সাধারণ ভাবে পার্থক্য দেখানো হইয়াছে—অতএব ব্যতিরেক অলংকার।

১৯৫৩

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

বিরোধাভাস, অসঙ্গতি, ব্যাজস্তুতি, শ্লেষ।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে কোন দুইটির অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) কাচ পড়ে থাকে যেখানে সেখানে,
ফিরেও দেখে না কেহ ;
হীরক খণ্ড লভিতে সবার
কতই না আগ্রহ !

(খ) অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে।

(গ) বৃথাই হোলো জন্ম রে তোর
সব হোলো তোর মিছে।
সারা জীবন ছুটলি শুধুই
মরীচিকার পিছে।

(ঘ) মেঘ ও তো নয়, মুক্তকেশীর
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি !
বিদ্যুৎ কোথা ? চেয়ে দেখ, ও যে
পাগলী মেয়ের অট্টহাসি।

উত্তর

১। **বিরোধাভাস :** প্রকৃত বক্তব্য বিষয়ের বিরোধ না থাকিলেও আপাত বিরোধ দেখানো হইলে বিরোধাভাস (বা বিরোধ) অলঙ্কার হয়। যথা—

প্রাপ্তি হতে বুঝিয়াছি পাব যা তা মিছে,
পাব না যা তাই সত্য, ছুটি তারই পিছে।

এখানে প্রাপ্তির সত্য হইতে প্রাপ্তির মিথ্যাত্ব এবং না-পাওয়ার সত্যতা বোধে বাহ্য বিরোধ। অর্থে পর্যবসান এই যে—বাসনার দ্বারা বাসনার নির্বাণ হয় না।

অসঙ্গতি ঃ কার্য ও কারণের আশ্রয় বিভিন্ন হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যথা—

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।

ব্যাজস্তুতি ঃ স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।

(খ) তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন বিদিত অজের কুলে।
জনক দুহিতা বিবাহ করি
তাহাতে ভাসালে যশের তরী।

যমক ঃ সমস্বর যুক্ত ব্যঞ্জনসমষ্টি নিরর্থকভাবে অথবা বিভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হইলে যমক অলঙ্কার হয়। যথা—

কাজ কি গোকুল ? কাজ কি গো কুল ?
ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল।

শ্লেষ ঃ একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়। যথা—

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ॥

১। (ক) অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। কাচ ও হীরক এখানে বর্ণনীয় বিষয় নয়। প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় অসার ও সার পদার্থ।

(খ) উৎপ্রেক্ষা অলংকার। বালুচরে জলচর প্রাণীর সংশয় করা হইয়াছে।

(গ) অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অপ্রাপ্য বা ভ্রান্ত লক্ষ্যের পরিবর্তে 'মরীচিকা' শব্দটি বসানো হইয়াছে। এছাড়া প্রথমাংশের ব্যর্থতার কারণ দ্বিতীয়াংশে রহিয়াছে বলিয়া কাব্যলিঙ্গও হইয়াছে।

(ঘ) অপহ্নুতি অলঙ্কার। উপমেয় মেঘ ও বিদ্যুৎকে প্রতিহত করিয়া চুলের রাশি ও অট্টহাসিকে স্থাপন করা হইয়াছে।

১৯৫৪

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে কোন তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—সমাসোক্তি, সাঙ্গরূপক, সন্দেহ, দৃষ্টান্ত, উল্লেখ।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন একটির অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) মেঘের মলিন বসনেতে মুখ
ঢেকেছে চন্দ্র তারা।
শ্রাবণ গগন সারা রাত ধরে
কেঁদে কেঁদে হোল সারা।

(খ) কিবা সে বদন-শোভা, যাই বলিহারি ;
মুগ্ধ অলি ধেয়ে আসে পদ্ম মনে করি।

(গ) ঝর্ণার ধারা নয় ওতো নয়,
চেয়ে দেখ ভাল করে,
কার মণিহার ছিঁড়ে গেছে, তাই
মণিরাশি ঝরে পড়ে।

(ঘ) কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল ;
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।

উত্তর

১। **সমাসোক্তিঃ** সমান কার্য, লিঙ্গ ও বিশেষণের সাহায্যে উপমেয়ে উপমানের ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

এখানে উপমেয় বসুন্ধরা, উপমান গৃহিণী নারী। (উপমেয় সজীব এবং উপমান নির্জীব হইলেও সমাসোক্তির ব্যাঘাত হইবে না।)

সাঙ্গরূপক ঃ উপমেয় ও উপমানের অভেদকে ঐ দুয়ের অঙ্গীভূত বিভিন্ন বিষয়ের অভেদ-কল্পনায় প্রকট করিলে সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হয়। যথা—

শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন-
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রু-বারি ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার-রব।

মূল উপমেয় শোককে ঝড় অর্থাৎ প্রলয়ের সঙ্গে অভেদে তুলনা করিয়া ঐ অভেদকে উত্তমরূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রলয়ের অন্যান্য অঙ্গ যথা বিদ্যুৎ, মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি প্রভৃতিকে অনুরূপ বর্ণনীয়ের উপর অভেদে আরোপিত করা হইয়াছে।

সন্দেহ : উপমেয় ও উপমান উভয় ক্ষেত্রেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তুলনা করিলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। যথা—

এ কি তন্বী, অথবা স্রোতস্বিনী ?
এ চিকুর, না বেতসচ্ছায়া ?

দৃষ্টান্ত : পৃথক বাক্যে বিবৃত দুইটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে অথচ তাহাদের সাধারণ ধর্ম এক না হইলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়। যথা—

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি, চাঁদে কৈল রাহুর আহার।

উল্লেখ : একই বস্তু বা ব্যক্তিকে অনেক প্রকারে উল্লেখ করিলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। যথা—

স্নেহে তিনি রাজমাতা বীর্যে যুবরাজ।

২। (ক) **সমাসোক্তি** অলঙ্কার। উপমেয়ে উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। চন্দ্রতারা এবং শ্রাবণ গগন উপমেয়। মানুষ উপমান। প্রথম পংক্তিতে রূপক।

(খ) ভ্রান্তিমান অলঙ্কার। এখানে মুখে পদ্মভ্রম কল্পিত হইয়াছে।

(গ) অপহ্নুতি অলঙ্কার। এখানে উপমেয় ঝর্ণার জলধারাকে নিষেধ করিয়া উপমান মণিহারের মণিকে স্থাপন করা হইয়াছে।

(ঘ) ব্যতিরেক অলঙ্কার। এখানে উপমান বংশীর ধ্বনি অপেক্ষা কল্লোলিনীর কলস্বরের মাধুর্যের আধিক্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৯৫৫

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ঃ—

বিভাবনা, প্রতীপ, উৎপ্রেক্ষা, লুপ্তোপমা, অপ্রস্তুতপ্রশংসা।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলঙ্কার নির্ণয় কর ঃ—

(ক) সেই অপদার্থ ক্লীব হবে সেনাপতি ?
শ্রেষ্ঠ যত বীর রণে হইবে চালিত
তাহার ইঙ্গিতে ? শশক হইবে নেতা
মৃগেন্দ্র কুলের ?

(খ) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

(গ) নয় নয় ও তো আষাঢ় গগনে
জলদের গরজন,
দুনিয়ার যত চাপা ক্রন্দন
গুমরি উঠিছে শোন্।

(ঘ) সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়।

উত্তর

১। **বিভাবনা ঃ** বিনা কারণে কার্যোৎপত্তি হইলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। যথা—

গোলাপ ফোটেনা তবু গোলাপের বাস
ঘিরে এরে চিরনিশিদিন।

প্রতীপ ঃ উপমানকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়। ১৯৫২ দেখ।

উৎপ্রেক্ষা ঃ উপমেয়কে উপমানরূপে বিতর্ক করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। ১৯৫১ দেখ। অপর উদাহরণ—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল ; যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।

এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝিলমের বাঁকা স্রোত খাপে ঢাকা তলোয়ারের সঙ্গে এমন ভাবে উপমিত হইয়াছে যে প্রকৃত নদীস্রোত অপেক্ষা তলোয়ারকে গ্রহণ করিতেই অধিক আগ্রহ জন্মে।

লুপ্তোপমা ঃ অনুরূপ গুণবিশিষ্ট বস্তুসমূহের সাদৃশ্য দেখাইলে উপমা অলঙ্কার হয়। উপমার চারি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ। এই চারিটি অঙ্গের কোনোটি না থাকিলে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয়। যথা—

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।

এখানে সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা : অপ্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয় নয় এমন কোনো বিষয় দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়কে পরিস্ফুট করিলে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হয়। যথা—

"কে লইবে মোর কার্য"—কহে সন্ধ্যা রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি ;
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল,—"স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য, করিব তা আমি।"

২। (ক) প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। শশক মৃগেন্দ্রকুলের নেতা এই উপমান বাক্য সমান কার্যে বা ধর্মে একত্র যুক্ত।

(খ) সমাসোক্তি অলঙ্কার। প্রকৃত বৈশাখে অপ্রকৃত মানুষের ধর্ম আরোপ করা হইয়াছে।

(গ) অপহ্নুতি অলঙ্কার। উপমেয় 'জলদের গরজনকে প্রতিষেধ করিয়া ক্রন্দনকে স্থাপিত করা হইয়াছে।

(ঘ) উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ; বাতাসের স্পর্শকে উপমান দিগ্বধূর অদৃশ্য অঞ্চলের স্পর্শ বলিয়া বিতর্ক করা হইয়াছে।

১৯৫৬

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোনও তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি, ব্যাজস্তুতি, রূপক, স্বভাবোক্তি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে কোন দুইটির অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) যৌবন বসন্তসম সুসময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন
ফিরে না ফিরে না হায় ফিরে না যৌবন।

(খ) বনজঙ্গলে মৃগ আছে কত
কস্তুরী মৃগ কয়টা মেলে ?
মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে ?
রসিক মানুষ কয়টা পেলে ?

(গ) হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা পরা তব কটিদেশ।

উত্তর

১। **নিদর্শনা**—১৯৫১ দেখ।

অতিশয়োক্তি : উপমেয়কে অতিক্ষীণ করিয়া বা গ্রাস করিয়া যেখানে উপমানই একান্তভাবে বিরাজ করে সেখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। বহুক্ষেত্রে উপমানই উপমেয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক) তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে

(খ) বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়

প্রথম অংশে 'পার্বতী' এই উপমেয় স্থানে উপমান স্বর্ণদীপকেই বসানো হইয়াছে ; দ্বিতীয় অংশে কোন্দল করার রীতির আতিশয্য বুঝাইতে বাতাসে ফাঁদ পাতারূপ অপ্রকৃতকে স্থাপন করিয়া অসম্বন্ধে সম্বন্ধ দ্যোতনা করা হইয়াছে।

ব্যাজস্তুতি ঃ ১৯৫৩ দেখ।

রূপক ঃ উপমেয়ে উপমানের সমগ্র আরোপ করাকে বা উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনাকে রূপক বলে।

প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে নাহি খেদ তাহে।

এখানে জীবের সহিত তারার এবং দেহের সহিত আকাশের অভেদ সম্পর্ক।

স্বভাবোক্তি ঃ ১৯৫১ দেখ।

২। (ক) উপমেয় ও উপমানের তুলনা করিয়া উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণনা করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। এখানে যৌবন ও বসন্তের তুলনা করিয়া যৌবনের নিকৃষ্টতার দিক দিয়া আধিক্য প্রতিপাদন করায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে।

(খ) সাধারণ ধর্ম সমান অথচ মূলতঃ পৃথক এমন দুইটি বিষয়ের, যথা প্রভৃতি শব্দ ব্যতীত ও অনুরূপ ক্রিয়া সহযোগে দুইটি বিভিন্ন বাক্যে তুলনা করিলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়। এখানে দুষ্প্রাপ্যতা সাধারণ ধর্ম, মেলা অনুরূপ ক্রিয়া, কস্তুরী মৃগ ও রসিক মূলতঃ পৃথক বিষয়, দুইটি বিভিন্ন বাক্যে তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে

প্রতিবস্তূপমা হইয়াছে। 'কয়টি মেলে' এই প্রশ্নটির মধ্যে 'মেলে না' এই অর্থের স্বরভঙ্গি থাকায় কাকু অলঙ্কার হইয়াছে।

(গ) বর্ণনীয় পদার্থে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি হয়। এখানে 'বসুন্ধরা' উপমেয়। তাহার উপর মাতার ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। 'সমুদ্র-মেখলা' শব্দটির মধ্যে সমুদ্র রূপ মেখলা এই ভাবটি থাকায় রূপক অলঙ্কার হইয়াছে। উপমান ও উপমেয় অভিন্নরূপে কল্পনা করিলে রূপক অলঙ্কার হয়।

১৯৫৭

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

বিভাবনা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধ।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলঙ্কার নির্দেশ কর :—

(ক) সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝরঝর
কাননে ফোটে নবমালতী কদম্ব কেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা মালিকা
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।

(খ) হল হল উছলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল
দেহ হইতে বাহির হইল ভূতগণ
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন।

(গ) অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
চেন কি তাদের ভাই—
দুই তুরঙ্গ জীবন মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম
দুয়েরি বল্‌গা নাই ?

উত্তর

১। **বিভাবনা ঃ** বিনা কারণে কার্যের উৎপত্তি হইলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। ১৯৫৫ দেখ।

ব্যতিরেক ঃ ব্যতিরেক অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের তুলনা করিয়া উপমেয়ের গুণাধিক্য বর্ণনা হয়। যথা—

নবীন নবনী নিন্দিত করে
দোহন করিছে দুগ্ধ।

অতিশয়োক্তি ঃ ১৯৫৬ দেখ।

উৎপ্রেক্ষা ঃ ১৯৫১ দেখ।

বিরোধ ঃ বিরোধ বা বিরোধাভাস অলঙ্কারে প্রকৃত বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিরোধ হয় না। যেমন—

সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে।

বাহ্যে বিরোধ। কালা ও শিবের সম্পর্ক বুঝিলে বিরোধের পর্যবসান।

২। (ক) একই প্রকার ব্যঞ্জনধ্বনির পুনঃপুনঃ বিন্যাসে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। এখানে প্রথম ছত্রে 'ঘ' ও 'র' দ্বিতীয় ছত্রে 'ক' এবং

তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে 'স' (ও 'শ') ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে। বরষা, নবমালতী, শরৎ ও শেফালিকায় মানুষের ব্যবহার আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। উপমেয়ে উপমানের ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।

(খ) এখানে প্রথম ছত্রে 'ল' 'হল', দ্বিতীয় ছত্রে 'ম' 'ল' তৃতীয় ছত্রে 'হ' এবং চতুর্থ ছত্রে 'ভ' ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হওয়ায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে। 'কাঁপে ত্রিভুবন' এখানে ত্রিভুবনে ব্যক্তির ব্যবহার (কম্পন) আরোপ হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কারের আভাস আছে।

(গ) কোনো অপ্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয় নহে এমন বিষয় দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়কে পরিস্ফুট করিলে অপ্রস্তুত প্রশংসা হয়। এখানে 'অগ্নি আখর' বা 'আকাশে নাম লেখা' ইত্যাদি বর্ণনীয় বিষয় নয়— দুঃসাহসিকতাই বর্ণনীয় বিষয় হওয়ায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। 'তুই তুরঙ্গ' ও 'জীবন মৃত্যু' অভিন্নরূপে কল্পিত হওয়ায় রূপক অলঙ্কার হইয়াছে, উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পিত হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। 'অগ্নি-আখরে' অংশেও রূপক হইয়াছে।

১৯৫৮

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোন **তিনটি** অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

অপ্রস্তুতপ্রশংসা, দৃষ্টান্ত, উল্লেখ, একাবলী, রূপক।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন্ **দুইটির** অলঙ্কার নির্ণয় **কর** ঃ—

(ক) ছাড় আই বল্লা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥
বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥

(খ) হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুলরাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল-সলিলে বিষ, তা হ'লে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?

(গ) তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্.
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ ॥

———

উত্তর

১। **অপ্রস্তুতপ্রশংসা**—১৯৫২, ১৯৫৫ দেখ।

দৃষ্টান্ত—১৯৫২, ১৯৫৪ দেখ।

উল্লেখ—১৯৫৪ দেখ।

একাবলী—এক একটি উদ্দেশ্য বা বিধেয় পরপর বাক্যে বিধেয় বা উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হইলে একাবলী হয়। যেমন—

এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥

রূপক—১৯৫৬, ১৯৫৪ দেখ।

২। (ক) অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার। "গোড়ায় কাটিয়া" ইত্যাদিতে প্রথমে অপমান করিয়া পরে প্রশংসাকে বুঝাইতেছে। "বড়র পীরিতি" ইত্যাদি অপ্রস্তুত বুঝাইতেছে প্রস্তুত নিজের অবস্থা।

(খ) "ফুলরাশি" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে উপমা এবং "বিমল-সলিলে বিষ" এই উক্তিতে অভেদ বর্ণনায় রূপক। "ভূমে লুটাইয়া শিরঃ" ইত্যাদিতে ইংরাজী Hyperbole।

(গ) "মিলন শয্যার" সহিত আসনের অভেদ আছে আবার অতিশয়োক্তিও আছে। সুতরাং এ দুয়ের সংকর। "অসীম বিচিত্র কান্ত" ইত্যাদি সার্থক বিশেষণ প্রয়োগের জন্য এখানে পরিকর অলংকার। "হে মোর রাজন্" "ওগো বিশ্বভূপ" ইত্যাদি উল্লেখে উল্লেখ অলংকার এবং "দেহে মনে প্রাণে" অংশে অভেদে ভেদরূপ অতিশয়োক্তি।

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে-কোন **তিনটি** অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

সমাসোক্তি, সন্দেহ, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, স্বভাবোক্তি।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন **দুইটির** অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) শোকের ঝড় বহিল সভাতে,
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

(খ) শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

(গ) একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে ;
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ সাপের নিশ্বাসে।

উত্তর

১। **সমাসোক্তি**—১৯৫২ দেখ।

সন্দেহ—১৯৫৪ দেখ।

অতিশয়োক্তি—১৯৫৬ দেখ।

উৎপ্রেক্ষা—১৯৫১, ১৯৫৫ দেখ।

ভ্রান্তিমান—প্রবল সাদৃশ্য হেতু যদি প্রকৃত বস্তুতে (উপমেয়ে) অন্য বস্তুর ভ্রম জন্মে তাহা হইলে ভ্রান্তিমান্ হয়। যেমন—

দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয় ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন।

এখানে অক্ষির প্রতিবিম্ব পদ্মভ্রম জন্মাইয়াছে।

স্বভাবোক্তি—১৯৫১ দেখ।

২। (ক) সাঙ্গ রূপক। ১৯৫৪ দেখ।

(খ) অতিশয়োক্তি ও উৎপ্রেক্ষার সংকর।

(গ) প্রতিবস্তূপমা। প্রথম বাক্যে উপমেয় দ্বিতীয় বাক্যে উপমান। চলে যাওয়া এবং শুকিয়ে যাওয়া একই সমান ধর্ম।

প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ যে কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অর্থান্তরন্যাস, অনুমান।

২। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :—

(ক) বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা।

(খ) বসুন্ধরা দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

(গ) সুধা হতে সুধাময় দুগ্ধ তার।

উত্তর

১। **অতিশয়োক্তি**—১৯৫৬ দেখ।

উৎপ্রেক্ষা—১৯৫১, ১৯৫৫ দেখ।

সন্দেহ—১৯৫৪ দেখ।

অর্থান্তরন্যাস--তুইটি ব্যাপারের সমর্থ্য-সমর্থক ভাবের (সামান্যের দ্বারা বিশেষ অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্য) চমৎকারিত্ব থাকিলে অর্থান্তরন্যাস হয়। যেমন—

(ক) এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

(খ) ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। তুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান ;

এখানে (ক) অংশে প্রথম পঙ্ক্তির সামান্য দ্বিতায় পঙ্ক্তির বিশেষের দ্বারা সমর্থিত। (খ) অংশেও ঐরূপ।

অনুমান—ন্যায়শাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রমাণটি অর্থাৎ ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের জ্ঞান যদি চমৎকারাতিশয়ের সঙ্গে উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে অনুমান অলংকার হয়। যেমন—

সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা তুলাইয়া গাছে।
তুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতক্ষণে আমারে চিনিল মাতা।

'মাতা' অর্থাৎ স্বদেশ জননী তাঁহাকে চিনিয়াছেন এই জ্ঞান পক্ব ফলের পতন হইতে অনুমিত।

২। (ক) অপহ্নুতি। 'বৃষ্টি' এই প্রকৃতকে গোপন করিয়া ক্রন্দন এই অপ্রকৃতকে স্থাপন করা হইয়াছে।

(খ) সমাসোক্তি। ১৯৫৪ দেখ।

(গ) ব্যতিরেক ও অতিশয়োক্তির সংকর।

প্রশ্ন

১। (ক) উদাহরণ যোগে উপমা ও রূপকের ভেদ নির্ণয় কর।

(খ) উদাহরণযোগে যে-কোনও তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :—

প্রতীপ, সমাসোক্তি, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান্।

উত্তর

১। (ক) উপমায় এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সাদৃশ্য। যেমন মুখ পদ্মের মত ; "কান্তের মত চাঁদ" ইত্যাদি। সাদৃশ্য মাত্র সমান ধর্মাদির দ্বারা ব্যক্ত হয়। বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কিছু প্রভেদ থাকিলেও সেকথা বলা হয় না। রূপকে দেখানো হয় যে সাদৃশ্য এত প্রবল যে একেবারে অভেদ না দেখাইলে নয়। এখানে বৈধর্ম্য কিছুমাত্র নাই এরূপ বিষয়টি ব্যঞ্জনায় জানানো হয়। যেমন "মুখ পদ্মই" বা "মুখপদ্ম"। তেমনি "জীবন-তরী", "বাহুলতা" ইত্যাদি।

(খ) **প্রতীপ**—১৯৫১ দেখ।

সমাসোক্তি—১৯৫২ দেখ।

দৃষ্টান্ত—১৯৫২ দেখ।

নিদর্শনা—১৯৫১ দেখ।

ব্যতিরেক—১৯৫৭ দেখ।

১। উদাহরণসহ সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

অনুপ্রাস, সমাসোক্তি, নিদর্শনা, বিষম, বিরোধাভাস।

পূর্বপূর্ব বৎসরের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বক্রোক্তি—কোনও বক্তব্যকে ঘুরাইয়া ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করিলে বক্রোক্তি অলংকার হয়। এই বক্রোক্তি দুইপ্রকারের। কাকু-বক্রোক্তি এবং শ্লেষ-বক্রোক্তি। যখন প্রশ্নচ্ছলে উত্তর বলিয়া দেওয়া হয় তখন কাকু-বক্রোক্তি। যেমন—

(১) কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?

(২) আমি কি মা নহি? জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?

অর্থ বা উত্তর ঐ প্রশ্নের মধ্যেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রোতার উত্তরের উপর নির্ভর করিতে হয় নাই।

শ্লেষ-বক্রোক্তি—এই বক্রোক্তি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রশ্ন বিনিময়ের উপর নির্ভরশীল। বক্তা এক বিষয়ে প্রশ্ন করিলে এবং তাহার বক্তব্যে শ্লেষ থাকিলে শ্রোতা ভিন্নভাবে উহা গ্রহণ করেন। যেমন—

প্রঃ **দ্বিজরাজ** হয়ে কেন **বারুণী** সেবন?

উঃ রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

এখানে দ্বিজরাজ = ব্রাহ্মণ, চন্দ্র। বারুণী = মদ্য, পশ্চিমদিক। প্রশ্নকর্তা প্রথম অর্থ ধরিয়া প্রশ্ন করিতেছেন। উত্তর দাতা দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়া উত্তর দিতেছেন।

১। সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে কোন দুইটির অলঙ্কার নির্দেশ কর :—

(ক) শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলি বনে

শিশির ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?

(খ) নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার আঁচল-খসা
হাতে দীপ শিখা।

(গ) রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।

উত্তর

(ক) স্মরণ অলংকার। শিউলি ফুলের শুভ্র শুচি করুণায় পূর্ণ রূপ ও গন্ধ সাদৃশ্যে মাতার স্মারক।

(খ) সমাসোক্তি অলংকার। সন্ধ্যার উপর বধূর ব্যবহার সমারোপিত হইয়াছে।

(গ) রূপক-পুষ্ট বিরোধাভাস অলংকার। রূপের মধ্যে অরূপের প্রত্যাশা বাহ্যতঃ বিরোধী। অর্থে পর্যবসান এই যে, এই অরূপ রস-স্বরূপ।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিত্রয় মধ্যে যে-কোন **দুইটির** অলঙ্কার-গুলি বুঝাইয়া বল :—

(ক) (প্রভাতে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে বলিতেছেন)—
উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !

(খ) (রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে বলা হইতেছে)

স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

(গ) এই দুটি

নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী

অর্জুন দিয়াছে ধরা।

২। নিম্ন-নির্দিষ্ট অলঙ্কারসমূহ হইতে যে-কোন **তিনটি** অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও :—

সমাসোক্তি ; বিরোধাভাস ; তদ্‌গুণ ; পরিবৃত্তি ; অপ্রস্তুতপ্রশংসা ; ব্যতিরেক ; উৎপ্রেক্ষা।

উত্তর

১। (ক) প্রতীপ ও অতিশয়োক্তির সংকর অলংকার।

(খ) উল্লেখ অলংকার।

(গ) ব্যতিরেক অলংকার।

২। পূর্ব পূর্ব প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। কেবল বিশেষগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

তদ্‌গুণ—নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হইতে গুণ সংগ্রহ করিলে তদ্‌গুণ। যেমন—তব মুখসক্ত ভৃঙ্গ শুভ্র হ'ল দশনরুচিতে।

(খ) পরিবৃত্তি বা বিনিময় চমৎকারিত্বের দ্বারা উপস্থাপিত হইলে এই অলংকার হয় যেমন—

"তিনি ভ্রাতাকে অজস্র স্নেহবাক্য দিয়া পরিবর্তে তাহার বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লন।"

———

ছন্দ

১৯৫৪

১। ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী? উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

('ছড়ার ছন্দ' বলিতে পূর্বে ছড়ায় যে একপ্রকার বিশিষ্ট রীতির ছন্দ প্রযুক্ত হইত তাহার বিষয় বুঝায়। এই ছন্দের (কখনো কখনো একমাত্র শেষের পর্বটি ছাড়া) সব পর্বই নিয়মিতভাবে চারিমাত্রার হইয়া থাকে। আর প্রতিপর্বে একটি প্রবল শ্বাসাঘাত বর্তমান থাকে। ঐ শ্বাসাঘাতের জন্য পর্বের আকার হয় সংক্ষিপ্ত এবং যতি অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্য রীতির ছন্দ অপেক্ষা ইহাতে ঝোঁকের (শ্বাসাঘাতের) আধিক্যের জন্য ইহাকে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ, বল-প্রধান বা ঝোঁক-প্রধান ছন্দ বলা হয়। আর ইহার মাত্রাসংখ্যা অর্থাৎ ঐ পর্ব-প্রতি চার শ্বাসগত উচ্চারণের রীতির দ্বারা মাত্রা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া **শ্বাসমাত্রিক** এই আখ্যাও ইহাকে দেওয়া যায়। শ্বাসাঘাত এই জাতীয় ছন্দে নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে কাজ করে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে চারের অধিক অক্ষর সংখ্যা পর্বে থাকিলে উহাকে সংকুচিত করিয়া চার অক্ষর বা চার স্বর = চার মাত্রা করিয়া স্বচ্ছন্দে পাঠ করা যায়। আবার পর্বে চারের একটি অক্ষর কম থাকিলে কোনও অক্ষরকে প্রসারিত করিয়া দুইমাত্রার ধরিয়া চার মাত্রার পূরণ করিয়া লইতে হয়। অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের মত ইহাতে এক অক্ষর (syllable)

একমাত্রা হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য ঐ শ্বাসাঘাতে অর্থাৎ ঝোঁক সহ উচ্চারণে। দৃষ্টান্ত—

০/০ ০ ০ ০/০ ০ ০ ০/০ ০ ০ ০/
(১) এপার : গঙ্গা | ওপার : গঙ্গা | মধ্যি : খানে | চর
০ ০/ ০ ০ ০ ০/ ০ ০ ॥/ ০ ০ ০/
তারি : মধ্যে | বসে : আছেন | শিব্ : সদা | গর
০/০ ০ ০ ০/০ ০ ০ ০ ০/ ০ ০ ০/ ০
(২) বিন্নুর : বয়স্ | তেইশ : যখন | রোগে : ধরল | তারে
০০/ ০ ০ ০/ ০
ওষু : ধে ডাক্ | তারে
০ ০/ ০ ০ ০ ০/ ০ ০ ০/০
ব্যাধির : চেয়ে | আধি : হল | বড়

শেষেরটি ছাড়া সর্বত্র চার মাত্রার পর্ব। অক্ষরের মাত্রাসংখ্যায় "শিব" অক্ষরটির দীর্ঘীকরণ ছাড়া কোনও অনিয়ম নাই।

২। পয়ার ছন্দকে 'তানপ্রধান' ছন্দ বলিবার তাৎপর্য কি? এই তানপ্রাধান্যের তাৎপর্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

পয়ার এবং পয়ার জাতীয় বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দোরীতির একটি বিশেষ গুণ ও ধর্মের দিক হইতে উহার ঐরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। বাঙ্লায় দুই প্রকারের অক্ষর বা Syllable রহিয়াছে—যৌগিক (স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত) এবং অ-যৌগিক বা মৌলিক। যৌগিক অর্থে

ঐ, ঔ, আই, আউ প্রভৃতি স্বর বা ঐস্বরযুক্ত ব্যঞ্জন এবং এক্ জল্ পত্ রক্ বন্ সন্ প্রভৃতি হলন্ত ব্যঞ্জন যুক্ত অক্ষর। সাধারণ বাঙ্‌লা উচ্চারণে মৌলিক যৌগিক সমস্ত অক্ষরই উচ্চারণে একমাত্রার সময়ের অধীন। অক্ষরবৃত্ত বা পয়ার জাতীয় ছন্দেও তাই। অর্থাৎ ইহার চরণ ও পর্বের নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার মধ্যে মৌলিক অক্ষরের স্থানে যৌগিক অক্ষর এবং যৌগিক অক্ষরের স্থানে মৌলিক অক্ষর স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। উহাতে ছন্দের মাত্রার অর্থাৎ উচ্চারণকালের কোনও ব্যতিক্রম হয় না বা ছন্দঃপতন হয় না। অথচ মাত্রাবৃত্তরীতির ছন্দে যৌগিক অক্ষর নিয়মিতভাবে দুই মাত্রার হওয়ায় উহাতে যেমন খুশী শব্দবিন্যাস চলে না। যেমন, "সাগর জলে সিনান করি" এস্থানে বলা চলে না "সমুদ্রজলে স্নান করি", অথবা "মর্মরে বন্ধন মন্ত্র জাগায় রে" এখানে বিকল্পে বলা যায় না যে "মরণে বাঁধন যত জাগিছে যে।" তাহা হইলে অনিবার্যভাবে ছন্দঃপতন হয়। অথচ পয়ার জাতীয় ছন্দে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" অংশকে "আর্যাবর্ত বৃহৎকথা স্বর্গের সন্ত্রাস" এরকম যুক্তাক্ষর বহুল শব্দে পরিবর্তিত করিলে অথবা "কর্পূরগৌরবরবি চিররাহুগ্রাসে" এই অংশকে যুক্তাক্ষরহীন "রাবণমহিমারবি রহে নতশিরে" এরূপভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইলে ছন্দের কোনও ত্রুটি ঘটে না। পয়ারের এই ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ উহার "আশ্চর্য শোষণশক্তি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর পয়ার ছন্দের উচ্চারণ রীতির মধ্যে একটা টান বা তান বা সুরের প্রবাহে ঐরূপ অক্ষর-নির্লিপ্ততা ঘটে বলিয়া ছান্দসিক ইহার মধ্যে তানপ্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং পয়ার জাতীয় ছন্দের নামকরণ করিয়াছেন—তানপ্রধান ছন্দ। এ সম্বন্ধে বলিবার কথা এই যে তানপ্রাধান্য এবং শোষণ শক্তি পয়ারের

উচ্চারণরীতির বৈশিষ্ট্য হইলেও ঐ ছন্দের নাম হিসাবে উহা স্থিরভাবে ও সমগ্রভাবে কোনও নির্দেশ দেয় না। নিম্নে দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইল। মাত্রসংখ্যা গণনায় যৌগিক অযৌগিক সব সমান মূল্যের—

(১) নির্মল তরুণ উষা | শীতল সমীর। ৮+৬

(২) অন্নপূর্ণা উত্তরিলা | গাঙ্গিনীর তীরে। ৮+৬

(৩) নীরবিন্দু দূর্বাদলে নিত্য কিরে ঝলঝলে ৮+৮
কেনা জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি। ৮+৮

২। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর—

(ক) গোপব ঃ ধূজন | বিকশিত ঃ যৌবন
পুলকিত ঃ যমুনা | মুকুলিত ঃ উপবন
নীল নীর পর | ধীর স ঃ মীরণ
পলকে ঃ প্রাণমন | খোয়।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। অষ্ট মাত্রিক পর্ব (৪+৪) এবং ষোড়শ মাত্রিক চরণ। আ, ঈ, প্রভৃতি মৌলিক ধ্বনির সম্প্রসারণ বহুলতার জন্য কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্ন-মাত্রাবৃত্ত।

(খ) ফিরিয়ে নে তোর | বেদের ঝুলি।

○ /○ ○ ○ ○/○ ○ ○
(ওমা) মজাস্ নে আর | আমায় কালী।
○ ○/ ○ ○ ○/○ ○ ○ ○ ○/○ ○
ভোজের খেলা | খেলতে ভবে | আমারে এক্ |
○ ○/○ ○
লা পাঠালি।

শ্বাসাঘাত বা শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। চতুর্মাত্রিক পর্ব। তৃতীয় চরণ দীর্ঘ। প্রথম চরণের প্রথম পর্বে অক্ষর সংকোচন। "ফিরিয়ে" এর উচ্চারণ হইবে "ফির্য়ে"।

○ ‖ ○ ○ ‖ ○ ○ ○ ○ ‖ ○ ○ ○ ○
(গ) বরং থাকো | মৌন হয়ে | সসংকোচে | লাজে।
‖ ○ ○ ○ ‖ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‖ ○ ○ ○
অত্যাচারে | মত্ত পারা | কভু কি হও | আত্মহারা?
‖ ○ ○ ○ ‖ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
তপ্ত হয়ে | রক্তধারা | ফুটে কি দেহ | মাঝে।

পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। চতুষ্পর্বিক চরণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণের শেষ পর্ব অপূর্ণ।

১৯৫৫

১। বাঙলা ছন্দে মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর কাহাকে বলা হয়। মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বরের মাত্রাবিচার সাধারণতঃ কিরূপে হইয়া থাকে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাও।

শুধু বাঙলা ছন্দে কেন, সাধারণ উচ্চারণেও ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে, স্বরের অন্যান্য পার্থক্যের সঙ্গে মৌলিক ও যৌগিক এই দুই বিভাগ

ধরিতে হয়। একটিমাত্র স্বর হ্রস্বই হোক আর দীর্ঘই হোক মৌলিক আখ্যা লাভ করে, যেমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, এ্যা, ও। যৌগিক আখ্যায় দুইটি স্বরের যোগে উদ্ভূত ঐ (অ+ই) এবং (অ+ উ) আই, আউ, প্রভৃতি। ইংরাজি নাম অনুসারে Diphthong. ইহা ছাড়া ব্যঞ্জনেরও যৌগিক অযৌগিক আছে। হলন্ত ব্যঞ্জনযুক্ত অক্ষরটি যৌগিক, যেমন এক্, দেখ্, জল্, ডুব্। লেখায় যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে সেখানে যুক্তের প্রথম ব্যঞ্জনটি পূর্ব বর্ণের সহিত ধরিয়া যৌগিক যেমন অন্ধ, পুন্জ, রক্ত ইত্যাদির প্রথম অক্ষর (syllable)।

সাধারণ উচ্চারণে মৌলিক স্বর এবং যৌগিক স্বর (এবং সেইরূপ মৌলিক ব্যঞ্জন এবং যৌগিক ব্যঞ্জন) একমাত্রার। অর্থাৎ মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতেও সেই পরিমাণ সময় লাগে। অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ যাহা অনেক পরিমাণে আমাদের সাধারণ গদ্য পাঠের উচ্চারণের মত, তাহাতে মৌলিক এবং যৌগিক স্বরের বা ঐ স্বরান্ত অক্ষরের উচ্চারণে মাত্রামূল্যের কোনও পার্থক্য হয় না। যেমন—

শৈবাল দীঘিরে বলে। উচ্চ করি শির

এখানে স্বরান্ত যৌগিক "শৈ" এবং ব্যঞ্জনান্ত "উচ্" হ্রস্ব বা একমাত্রার। তেমনি—

কৌতুকে নাচেন সাধু | বৈতরণী তীরে

অথবা, "আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা" ইত্যাদির ঐ-কার ঔকার-যুক্ত অক্ষর অন্যান্য অক্ষরের সহিত সমমূল্যের। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান (যৌগিক-দ্বিমাত্রিক) ছন্দে ঐরূপ যৌগিক

স্বরান্ত অক্ষর আবশ্যিকভাবে দীর্ঘ বা দুইমাত্রার বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা ছন্দঃপতন ঘটে। যেমন—

(১) একি কৌতুক | নিত্ত নূতন | ও গো কৌতুক | ময়ী

(২) তীর ময় শৈবাল | পান্নার টাঁকশাল

(৩) এ দেশের বৈরী যে | চৈনিক সৈনিক

ইত্যাদি স্থলে ঐ এবং ঔ যুক্ত অক্ষর দীর্ঘ বা দুই মাত্রার। ছড়ার বা শ্বাসমাত্রিক ছন্দে শ্বাসাঘাতের দ্বারা মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলিয়া ঐকার ঔকার কখনও একমাত্রার কখনও প্রয়োজন বশে দুই মাত্রার। যেমন—

চৌবে হ'ল | তৈমুর্লঙের্ | বৈমাত্রেয় | ভাই

এখানে চৌ, তৈ, বৈ এক মাত্রার। কিন্তু—

১। খৈ খাও | দৈ দাও | বৈ রাখ | তুলে

২। গৌর্ মাঝি | নিয়ে যায় | চৌবেড়ে | দিয়ে

এখানে দুই মাত্রার বা দীর্ঘ। সুতরাং বুঝা গেল ঐ, ঔ বা ঐ দুই যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর (সেই মত যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ও) ছন্দের রীতি অনুযায়ী হ্রস্ব এবং দীর্ঘ উভয় ভাবেই উচ্চারিত হইতে পারে।

২। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী? এই ঢঙের ছন্দে মাত্রা হিসাবের পদ্ধতি কী? দৃষ্টান্ত সাহায্যে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে বিশেষ মূল্য দিয়া স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দে যে একটি টানের প্রবাহ থাকে তাহার ফলে ব্যঞ্জনগুলি যেন স্বকীয় মূল্য লাভ

করিতে পারে না অর্থাৎ যৌগিক, অযৌগিক সমস্ত অক্ষরই একই প্রকার মাত্রামূল্য লাভ করে। যেমন—

মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল সৌদামিনী,

ইত্যাদি স্থলে মন্, বৃন্, অম্ রম্ বিশ্ গর্ সৌ প্রভৃতি যৌগিক অক্ষরগুলি অন্যান্য মৌলিক অক্ষরের মতই হ্রস্ব। কিন্তু ঐ রূপ অক্ষর নিম্নলিখিত স্থান সমূহে দীর্ঘ—

o o || o o o o || o o || || o o || o
১। ভো মহার্ণব | নীল ভৈরব | গর্জদ্ জল ভঙ্গে

o o || o o || o ooo o o || o o o o
২। একী কৌতুক | নিত্য নূতন | ওগো কৌতুক | ময়ী

|| o o || o o || o o || o
৩। অঞ্চল সিঞ্চিত | গৈরিকে স্বর্ণে

এই পঙ্‌ক্তিগুলি ধ্বনিপ্রধান ছন্দের। ইহাতে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার। ইহাতে কখনও কখনও 'আ' 'ঈ' 'ঊ' প্রভৃতি মৌলিক অথচ পুরাতন দীর্ঘ অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ চলে, তবে এ সম্বন্ধে স্থির নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নাই। যেমন—

রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা সুন্দর | চক্ষে

এখানে "রূ" দীর্ঘ, কিন্তু দী, আ প্রভৃতি হ্রস্ব। আবার যেমন—

একে পদ পঙ্কজ | পঙ্কে বিভূষিত | কণ্টকে জরজর | ভেল

এখানে "ভূ" দীর্ঘ, কিন্তু একারান্ত অক্ষরগুলি হ্রস্ব। অবশ্য সর্বত্র যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দীর্ঘ। সংস্কৃত-অপভ্রংশে মৌলিক দীর্ঘ

অক্ষরগুলি সর্বত্র দীর্ঘ। এখানে স্থানে স্থানে, প্রয়োজন বশে। তবু বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্ত বহুল পরিমাণে অপভ্রংশের ধারা রক্ষা করিতেছে। এই ছন্দের এখনকার দৃঢ় নির্দিষ্ট নিয়ম হইল যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দীর্ঘ বা দুই মাত্রার। অতএব ইহাকে যৌগিক-দ্বিমাত্রিক ছন্দও স্বচ্ছন্দে বলা চলে।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর :—

(ক)

‖ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০

অন্তরে : জানিয়া | নিজ অপ : রাধ

০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০

করযোড়ে : মাধব | মাগে পর : সাদ

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০

নয়নে গ : লয়ে লোর | গদগদ : বাণী

‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ‖ ০

রাইক চরণে প | সারল পাণি

অষ্টমাত্রিক পর্বের ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। মৌলিক অক্ষরের, 'আ' প্রভৃতির কোথাও কোথাও দীর্ঘীকরণের জন্য অপ-ভ্রংশাত্মক প্রাচীন রীতির মাত্রাবৃত্ত। পর্বাঙ্গ নিয়ত চার মাত্রার।

(খ) নিশার : স্বপন : সম | তোর : এ : বারতা

রে দূত !** অমরবৃন্দ | যার : ভুজবলে

কাতর* সে ধনুর্ধরে | রাঘব : ভিখারী

বধিল : সম্মুখ : রণে ?** | ফুলদল : দিয়া

কাটিলা কি : বিধাতা : শাল্ | মলী তরুবরে ?**

| তে যতি চিহ্ন, *তে অর্ধচ্ছেদ এবং ** চিহ্নে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে।

অক্ষরবৃত্তের বিশেষ বিভাগ মধুসূদনীয় অমিত্রাক্ষর বা অমিতাক্ষর-ছেদ ছন্দঃ। এখানে পয়ারের মত চরণের শেষে অন্ত্যযতির স্থানে সর্বত্র ছেদ পড়িতেছে না, পড়িতেছে ভাবানুসারে পঙ্‌ক্তির মধ্যে বা শেষে যে কোনও স্থানে। যদিও পয়ারের মত চৌদ্দ অক্ষর এবং চৌদ্দমাত্রার চরণ বিন্যাস ঠিকই আছে, আর অষ্টমাক্ষরের পর প্রথম যতি ঠিকই আছে।

০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০

(গ) কে বা শোনে ঃ কার্ কথা | কাঁদিস্ নেঃ ফুপিয়ে

! ‖ ০ ০ ০ ‖ ‖ ‖ ০ ০ ০

কোপের উ ঃ পরে কোপ | ফ্যাল ঝুপ ঃ ঝুপিয়ে !

০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০

কোদালের ঃ মুখ হতে | নেরে চাপ ঃ লুফিয়ে

‖ ০ ০ ০ ০ ০

চল্ মাটি ঃ কুপিয়ে

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ০ ০ ০

চৌকোর্ ঃ চার্ কোণ্ | ঠিক্ মাপ্ ঃ জুপিয়ে

৮ + ৭ = ১৫ মাত্রার চরণের ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য মধ্যেকার ১টি চরণ সংক্ষিপ্ত একপর্বিক।

১৯৫৬

১। বাঙলা ছন্দের বিচারে হ্রস্বমাত্রা ও দীর্ঘমাত্রা এই ভেদ করা চলে কি? এ বিষয়ে আলোচনা কর।

অক্ষরের হ্রস্বমাত্রা ও দীর্ঘমাত্রার ভেদ সাধারণভাবে বাঙলা গদ্যের উচ্চারণে নাই। কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও আছে।

মাত্রা বলিতে একটি অক্ষরের উচ্চারণের সময় মূল্যের একক বুঝায়। হ্রস্বমাত্রা বা একমাত্রার উচ্চারণে যে সময় ব্যয়িত হয় দীর্ঘমাত্রার উচ্চারণে তাহা অপেক্ষা বেশি, ধরা যাক প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। বাঙলা পয়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষরের উচ্চারণে সব অক্ষরই হ্রস্বমাত্রিক, কেবল শব্দের শেষ অক্ষরটি যদি ব্যঞ্জনান্ত হয় তাহা হইলে উহা প্রসারিত হইয়া দুই মাত্রার মূল্য লাভ করে। যেমন—

০ ০ ০ ॥ ০ ০ ০ ০ ০ ॥
(১) মহাভারতের কথা | অমৃত সমান্

০ ॥ ০ ০ ০ ০ ॥
(২) কেবল্ একটি দীর্ঘশ্বাস

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ্ করুক্ আকাশ্

০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
এই তব মনে ছিল আশ্

অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের মধ্যে থাকিলে অন্যান্য অক্ষরের মতই হ্রস্ব, কিন্তু শব্দের শেষে থাকিলে প্রসারিত হইয়া দীর্ঘ হয়। অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দে যাহাই হোক মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে মৌলিক অক্ষর এবং যৌগিক অক্ষরে পার্থক্য আছে। মৌলিক অক্ষর সাধারণভাবে একমাত্রার, আর যৌগিক অক্ষর অবশ্য দুই মাত্রার। যেমন—

॥ ০ ০ ॥ ॥ ॥ ০ ০ ॥
(১) পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারায়্।

॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥ ০ ০ ॥
সন্ধ্যা বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়॥

০ ০ ‖ ‖ ০০ ‖ ‖ ০ ‖ ‖ ০ ০ ০ ০

(২) রূপযৌবন্ উপঢৌকন্ দেবেন কন্যা তাহারে।

০ ০ ০০ ‖ ০ ‖ ০ ‖ ‖ ০০ ‖ ০০০

তাই পরেছেন্ চীনাংশুকের পট্টবসন্ বাহারে।

আবার এই ছন্দে কখনও কখনও পূর্বেকার মতের মৌলিক দীর্ঘ অক্ষর ও দীর্ঘমাত্রার হইয়া থাকে। যেমন—

‖ ০ ‖ ০ ‖ ০ ০ ০০ ‖ ০ ০ ০০ ‖ ‖

(১) দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী

‖ ০ ০ ‖ ০০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(২) রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি |

‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ‖

পাগল শিব প্রম | থেশ্

বাঙলায় সংস্কৃতের মত হ্রস্বমাত্রা এবং দীর্ঘমাত্রা স্থিরভাবে নির্দিষ্ট নাই। না থাক, উহার ব্যবহার আছে। ছন্দে প্রয়োজনবশে অক্ষরের দীর্ঘীকরণ করা হয় বা তুই মাত্রার মূল্য নির্দেশ করা হয়।

✓২। **বাঙলা ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী? দৃষ্টান্ত দ্বারা— ইত্যাদি—**

১৯৫৪ এর প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। ছন্দোলিপি কর:—

‖ ০০ ০০ ০০ ‖ ০০ ‖ ০০

✓(ক) চন্দন : তরু যব | সৌরভ : ছোড়ব |

০০ ০০ ০ ০ ০০ ‖ ০

শশধর : বরিখব | আগি।

‖ ‖ ০০ ০০ ০০ ০০ ‖ ০০

চিন্তা : মণি যব | নিজগুণ : ছোড়ব।

০ ‖ ০ ০০০ ০ ‖ ০

কিমোর : করম অ | ভাগী॥

অষ্টমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। ত্রিপদী আকারে বিন্যাসের যোগ্য। শেষ পর্ব অপূর্ণ। কেবল যৌগিক অক্ষরই নয়, মৌলিক দীর্ঘ অক্ষরের স্থান-বিশেষে দীর্ঘতার জন্য প্রাচীন অপ-ভ্রংশাত্মক মাত্রাবৃত্ত।

(খ) অন্ধ যে : কিরূপ : কভু | তার : চক্ষে : ধরে
নলিনী ? * * রোধিলা : বিধি | কর্ণ পথ : যার
লভে কি সে : সুখ কভু | বীণার : সুস্বরে ? * *
কি কাক, : কি পিকধ্বনি | সমভাব তার * *

মধুসূদনীয় অমিত্রচ্ছন্দ বা আরও যথার্থভাবে অমিতাক্ষর-ছেদ ছন্দ। লম্বা দাঁড়ি যতির চিহ্ন। চরণান্তে সর্বত্রই যতি আছে বলিয়া চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। * * স্থানে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে।

(গ) উড়িছে ধোঁওয়া | ঘুরিছে ধোঁওয়া |
আকাশে আঁকি | গাঙ্।
ভস্মাবৃত | বহ্নি আর
রাংতা মোড়া | রাং ॥

পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। "ওয়া" উচ্চারণে এক অক্ষর ধরিয়া একমাত্রা। ত্রিপদী আকারে বিন্যাসের যোগ্য। শেষ পর্ব অপূর্ণ।

১৯৫৭

১। পয়ারছন্দ হইতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দোরীতির প্রাথমিক রূপ হইল পয়ার। ইহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা কবিতার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বাহন। ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি এই পয়ারেরই বিস্তৃত রূপ। পয়ারের বৈশিষ্ট্য হইল—চোদ্দ অক্ষরের এবং এক অক্ষর একমাত্রা ধরিয়া চোদ্দমাত্রার চরণ। চরণান্তে ভাবসমাপ্তি এবং ছেদচিহ্ন। প্রতি দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল। চরণের মধ্যে অষ্টমাক্ষরের পর যতি বা বিশেষ বিরাম এবং চরণের শেষে পরের ছয় অক্ষরের পর যতি। ফলে চরণের শেষে ছেদ ও যতির মিলন স্থল। যেমন—

oo o o o o oo o oo oo o
(১) মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
o o o o o o o o o o o o o o
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান ॥
ooooo oo o o o o o o o o
(২) অন্নপূর্ণা উত্তরিলা | গাঙ্গিনীর তীরে।
oo o o o o o o o o o o o
পার কর বলিয়া ডা | কিলা পাটনীরে ॥

"অমিত্রাক্ষর" ছন্দের ভিত্তি এই পয়ার, অথচ গুণের দিক হইতে ইহা পয়ার অপেক্ষা অত্যন্ত পৃথক। অমিত্রাক্ষরের প্রতি চরণে চোদ্দ অক্ষর এবং ইহার যতি বিভাগও পয়ারের মত ৮+৬। পার্থক্য এই যে পয়ারে চরণান্তে ভাবসমাপ্তি বা ছেদবিন্যাস আবশ্যিক।

অমিত্রাক্ষরে তাহা নহে। ইহাতে ছেদ চরণের মধ্যে, অন্তে বা পরবর্তী চরণগুলির প্রায় যে-কোনও স্থানে পড়িতে পারে। বলা যাইতে পারে ইহাতে ছেদ পয়ারের মত অন্ত্যযতির বশীভূত নহে। ছেদের এই স্বাধীনতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান লক্ষণ। ইহার গৌণ লক্ষণ হইল মিল বা মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যানুপ্রাসের অবিদ্যমানতা। অথচ এই গৌণ লক্ষণ ধরিয়াই ইহার নামকরণ হইয়াছে অমিত্রাক্ষর। একটি উদাহরণ দ্বারা অমিত্রচ্ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য বুঝানো যাইতে পারে। নিম্নলিখিত অংশে যতিস্থানে লম্বা দাঁড়ি চিহ্ন এবং ছেদ স্থানে তারকা-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিশার স্বপনসম | তোর এ বারতা |
রে দূত ! * * অমরবৃন্দ | যার ভুজবলে |
কাতর * সে ধনুর্ধরে | রাঘব ভিখারী |
বধিল সম্মুখ রণে ! ** | ফুলদল দিয়া।
কাটিলা কি বিধাতা শাল্ | মলী তরুবরে ?** |

দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে চরণান্তে মিলহীনতা এবং ছেদের অবশ্য বিধান নাই। চরণের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে ছেদ পড়িয়াছে। ফলে মধ্য যতির বিরাম এবং ছেদের বিরাম খুব কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পয়ারে পর্বমধ্যবর্তী অর্ধযতির স্থান কোনও শব্দের মধ্যে হইলেও হইতে পারে। সেখানে অর্ধযতি প্রতি চারি মাত্রার পর নিয়মিত। কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দে অর্ধযতি শব্দ ধরিয়া প্রায়শই পড়ে। যেমন—

মহাভার : তের কথা | অমৃতস : মান।

কিন্তু, নিশার : স্বপন : সম | তোর এ : বারতা

মধুসূদনীয় অমিত্রচ্ছন্দের দৃষ্টান্তে গিরিশচন্দ্রের নাট্যে অবলম্বিত অসমান পঙ্‌ক্তির গৈরিশ ছন্দ, আঠারো অক্ষরের চরণের ৮ + ১০ এর অমিত্রচ্ছন্দ এবং চরণান্ত মিল বজায় রাখিয়া শুধু ছেদ অমিত্রচ্ছন্দের মত রাখিয়া রবীন্দ্র-প্রবর্তিত মিত্রাক্ষর-ছন্দ অমিতাক্ষর ছন্দ—এ সকল গঠিত হইয়াছে।

২। ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ধ্বনির প্রাধান্য সর্বত্রই কিভাবে স্বীকার করিতে হয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ইহার পূর্বেকার নাম মাত্রাবৃত্ত। মাত্রা গুণিয়া ছন্দের স্বরূপ জানা যাইত বলিয়া ঐরূপ নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্‌লা অক্ষরের মাত্রা সুনির্দিষ্ট নহে বলিয়া মাত্রা গণনায় ঐরূপ ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না! এজন্য ঐ ছন্দের একটি বিশিষ্ট গুণের উপর ছন্দের নামকরণ করা হইয়াছে।

এই ছন্দে অক্ষরের (syllable) ধ্বনিমূল্য সমধিক। প্রতিটি ধ্বনির যথাযথ মূল্য দিয়া সেগুলি স্পষ্টভাবে ইহাতে উচ্চারণ করিতে হয়। অবশ্য ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেই এরূপ স্পষ্ট উচ্চারণ সম্ভব। এরূপ স্পষ্টভাবে ও পৃথক্ মূল্য দিয়া উচ্চারণ করিবার ক্ষেত্রে যৌগিক অক্ষর (স্বর ও ব্যঞ্জন) অর্থাৎ ঐ, ঔ, আই, আউ প্রভৃতি যৌগিক স্বর বা স্বরান্ত অক্ষর এবং অন্ পুন্ রক্ পত্ ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ বা দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইজন্য ধ্বনিপ্রধান ছন্দ সব সময়েই যৌগিক-দ্বিমাত্রিক।

অন্য দুই রীতির ছন্দে অক্ষরগত ধ্বনির উচ্চারণের স্পষ্টতা প্রয়োজনীয় নহে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরের ধ্বনিমূল্য উচ্চারণগত একটি টান বা তানের প্রবাহে গৌণ হইয়া পড়ে। আর শ্বাসাঘাত

ছন্দে শ্বাসপাত বা ঝোঁক দেওয়া প্রধান লক্ষণ হওয়ায় অক্ষরের উচ্চারণ ঐ ঝোঁকের শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য। কিন্তু ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষরের অতিরিক্ত সুরের টান বা তান শক্তি বা রবীন্দ্র-কথিত শোষণ শক্তি থাকে না, ঝোঁক দেওয়ার ভাবও ইহাতে প্রবল নয়। এইজন্য ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি যেমন পৃথক্ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় তেমনি যৌগিক অক্ষরও দীর্ঘমাত্রার মূল্য লাভ করে। উদাহরণ সহকারে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে—

॥ ॥
নগরীর দীপ্ নিবেছে পবনে
॥ ॥ ॥
দুয়ার্ রুদ্ধ পৌর ভবনে
॥
নিশীথের্ তারা শ্রাবণ-গগনে
॥
ঘন মেঘে অবলুপ্ত

এই পঙ্‌ক্তিগুলির উচ্চারণে যৌগিক অক্ষরগুলি নিশ্চিতভাবে দীর্ঘ পাঠ করিতে হইতেছে। তাছাড়া ইহার অক্ষরগুলিও পৃথক্ পৃথক্ কাটা কাটা ভাবে উচ্চারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে ব্যঞ্জনের ঐ প্রকার স্পষ্ট উচ্চারণ নাই, যৌগিক অক্ষরগুলি শব্দমধ্যবর্তী হইলেও একমাত্রার—

০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
০ ০ ০০০০ ০ ০ ০০ ০ ০
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি

০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
অনাথ পিন্‌ডদ কহিল অম্‌বুদ
০ ০ ০
নিনাদে।

এখানে যেন একটি বিশেষ শক্তি মৌলিক-যৌগিক সকল অক্ষরেরই সমান মূল্য দিতেছে। এজন্য এই ধরণের অক্ষরমাত্রিক ছন্দে যৌগিকের স্থানে মৌলিক (অর্থাৎ লঘু স্থানে গুরু) অথবা মৌলিকের স্থানে যৌগিক অক্ষর স্বচ্ছন্দে বসানো চলে। কবি বর্ণনাটিকে গুরুগম্ভীর করিবার ইচ্ছা করিলে যত খুশী গুরু অক্ষর চরণ বা পর্বের মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে পারেন, উহাতে ছন্দোভঙ্গ হইবার কোনও ভয় থাকে না। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধানে লঘুস্থানে গুরু বা গুরুস্থানে লঘু যত্রতত্র সন্নিবেশ করিতে পারা যায় না। ধ্বনির প্রাধান্যই ইহার কারণ।

৩। **ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর।**

০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০০ ‖ ০ ০
(ক) একে কুল ঃ কামিনী | তাহে কুহু ঃ যামিনী ¦
‖ ০ ০ ০০ ০ ০ ‖
ঘোরগ ঃ হন অতি | দূর্।

‖ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০
আর তাহে ঃ জলধর | বরিখয়ে ঃ ঝরঝর ¦
‖ ০ ০ ০০ ‖ ‖
হামযা ঃ ওব কোন্ | পুর্।

অষ্টমাত্রিক পর্বের মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান। আ, ও প্রভৃতি মৌলিক দীর্ঘ অক্ষরেরও প্রায়শঃ দীর্ঘীকরণ ইহাতে করা হইয়াছে

বলিয়া প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত। ত্রিপদীর শেষ পর্ব অপূর্ণ।

(খ) ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জল সিন্‌চিত্ত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে
ঘন গৌরবে | নবযৌবনা | বরষা
শ্যাম গম্ভীর | সরসা।

ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। যৌগিক অক্ষরগুলির অবশ্য দীর্ঘতা। ৩+৩ এর পর্বাঙ্গ। তৃতীয় অক্ষর সর্বত্র দীর্ঘ হওয়ায় অর্ধযতি দীর্ঘের টানের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রতি দুই চরণে মিল। চার চরণের স্তবক।

(গ) ইন্‌দ্র লোকের্ | রীত্ এ কি
লুকিয়ে যেতে | আস্‌তে হয়।
দেব্‌তা হয়েও | তোর দেখি
লুকিয়ে ভালো | বাস্‌তে হয়।

শ্বাসাঘাত বা ছড়ার ছন্দ। চারমাত্রার পর্ব। দুই পর্বে চরণ। চার চরণে স্তবক। ছন্দের প্রয়োজনে কয়েকটি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দীর্ঘায়িত হইয়াছে। "লুকিয়ে"র উচ্চারণে "কিয়ে"—১ মাত্রা—"লুক্যে"।

১৯৫৮

১। ছন্দের ভিতরে শোষণশক্তি বলিতে কী বোঝা যায় ? উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত বা পয়ার-জাতীয় ছন্দের আশ্চর্য শোষণ শক্তির কথা বলিয়াছেন। শোষণ শক্তি বলিতে যৌগিক অক্ষরকে শোষণ করিয়া লওয়ার ক্ষমতা বুঝায়। এই ছন্দের এমন একটি শক্তি আছে যাহাতে লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু বা মৌলিক অক্ষরের স্থানে যৌগিক অক্ষর বসাইলেও ছন্দপতন হয় না। যেমন "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে" এইরূপ লঘু অক্ষরযুক্ত পঙ্‌ক্তিতে বা পর্বগুলিতে যদি গুরু অক্ষরযুক্ত শব্দ বসানো যায় যেমন "পাষাণ মূর্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে" অথবা এমনকি "প্রস্তর মূর্ছিয়া যায় গাত্রের সন্তাপে" তাহা হইলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে না। অর্থাৎ এই জাতীয় ছন্দে লঘুগুরু সকল অক্ষরের উচ্চারণে সমান সময় লাগে। লঘু অক্ষরের বেলায় কম সময় সুতরাং এক মাত্রা আর গুরু বা যৌগিক অক্ষরের বেলায় বেশি সময় বা দুই মাত্রা ব্যয় করিতে হয় এমন নহে। ঐরূপ লঘুগুরু মাত্রা-পার্থক্য মাত্রাবৃত্ত রীতির বৈশিষ্ট্য, অক্ষরবৃত্তের নহে। পয়ার-জাতীয় ছন্দে এরূপ লঘুগুরু অক্ষর যথেচ্ছ সন্নিবেশিত করা যায় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির" এরূপ লঘু অক্ষরাত্মক শব্দ হইতে "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত" এরূপ গুরু অক্ষরযুক্ত শব্দও একই চোদ্দ অক্ষরের চরণে অনায়াসে সন্নিবেশিত হইতেছে। উচ্চারণে একটি হইতে অপরটিতে বিন্দুমাত্র সময়ের পার্থক্য ঘটিতেছে না।

অথচ মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে এরূপ ঘটিবার নহে। সেখানে গুরু অক্ষরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে। সুতরাং লঘু অক্ষরের বিকল্পে গুরু অক্ষর বসানো যায় না।

২। পর্ব ও পর্বাঙ্গ কাহাকে বলে ?

বাঙলায় বাক্যের উচ্চারণে ঝোঁক দিয়া এক একটি শব্দগুচ্ছ আমরা উচ্চারণ করি। যেমন "কলিকাতা হইতে | পঞ্চাশ মাইল দূরে | পীচের রাস্তার নিকটে | হাট বসিয়াছে |" একটি শব্দগুচ্ছের উচ্চারণ শেষ হইলেই আমাদের থামিতে হয় এবং শ্বাসাঘাত দিয়া পুনশ্চ শব্দগুচ্ছের উচ্চারণ আরম্ভ করিতে হয়। অর্থ শেষ না হইলেও এইরূপ যে স্বাভাবিক বিরাম ইহারই নাম "যতি"। যতির দ্বারা বিভক্ত এক একটি শব্দগুচ্ছকে "পর্ব" নাম দেওয়া হইয়াছে। আমাদের উচ্চারিত দীর্ঘবাক্যগুলি ঐরূপ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ঐরূপ পর্বগুলির মধ্যেও স্থানে স্থানে আমরা অতি স্বল্প বিরাম দিয়া থাকি। ঐরূপ বিরামকে অর্ধ-যতি বলা যায় এবং পর্বের মধ্যে অর্ধ যতির দ্বারা বিভক্ত অংশগুলিকে পর্বাঙ্গ বলা যায়।

সাধারণ গদ্যে বাক্যের উচ্চারণে পর্ব ও পর্বাঙ্গের যে ব্যবহার তাহারই বিশিষ্ট রূপ পাই পদ্যে। অর্থাৎ পদ্যে ঐ যতি ও যতির দ্বারা বিভক্ত পর্ব একটা বিশেষ প্যাটার্ন্ অনুসারে গ্রথিত থাকে। যেমন—

(১) ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন | নির্বোধ : অতি | ঘোর

(১) যত্নশৈলে ঃ শব্দসিন্ধু | করিয়া মন্ ঃ থন ।
অমিত্রাক্ষ ঃ রের সুধা | করেছে অর্ ঃ পণ ।

(৩) সাম্‌নে ঃ কেতুই | ভয় ঃ কর্‌ছিস্ | পিছন ঃ তোরে | ঘিরবে

এই সকল দৃষ্টান্তে দাঁড়ি চিহ্ন দ্বারা পর্ব এবং কোলোন চিহ্ন দ্বারা পর্বাঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কবিতায় পর্ববিন্যাস গদ্যের মত বিশৃঙ্খল নহে। অর্থাৎ গদ্যে পর্বের অক্ষর ও মাত্রায় একের সঙ্গে অপরটির বা বাক্যের মধ্যবর্তী পর্বগুলির কোনও সামঞ্জস্য নাই। কবিতায় পর্বের প্যাটার্‌ন্ ৬+৬+৬, ৮+৮+১০, ৬+৬+৮, ৪+৪+৪+২ এইরূপ। সচরাচর একটি প্যাটার্‌ন্ অনুযায়ী একটি গোটা কবিতার সব চরণ বিন্যস্ত হয়। এইভাবে বলা যায় যে কবিতায় সম-আয়তনের কয়েকটি পর্বের বিচিত্র বিন্যাস। পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গের কিরূপ বিন্যাস হইবে সে সম্বন্ধে বলা যায় যে 'অমিত্রাক্ষর' এবং তদনুসারী ভাবের-বশীভূত ছন্দে পর্বাঙ্গ শব্দভিত্তিক। অন্যত্র চার-মাত্রার পর্বে পর্বাঙ্গ ২+২, পাঁচমাত্রার পর্বে ৩+২, ছয়মাত্রার পর্বে ৩+৩, আটমাত্রার পর্বে ৪+৪—এই হইল পর্বাঙ্গ বিন্যাসের সমতা।

(বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি - ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস)

৩। **ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর।**

(ক) থীর ঃ বিজুরি | বরণ গোরী।
পেখিনু ঃ ঘাটের | কূলে।
কানড় ঃ ছান্দে | কবরী বান্ধে।
নবমল্লিকার | মালে।

ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত | ত্রিপদীর শেষ পর্বটি অপূর্ণ। সর্বত্র যৌগিক অক্ষর অবশ্য দীর্ঘ হইলেও শেষ চরণের "মল্লি"র মল্ অক্ষরটি দীর্ঘ হয় নাই। ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম। ছন্দোরক্ষার্থে পাঠ করিতে হইবে "নবমলিকার"।

(খ) হে বরদে* তব বরে | চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি | ** তোমার পরশে
সুচন্দন বৃক্ষশোভা | বিষবৃক্ষ ধরে !**
হায় মা* এ হেন পুণ্য | আছেকি এ দাসে ?**

তানপ্রধান রীতির অমিত্রাক্ষর ছন্দ। লম্বা দাঁড়ি স্থানে যতি, সর্বত্র অষ্টমাক্ষরের ও চতুর্দশ অক্ষরের পর। একটি তারকা চিহ্ন অর্ধচ্ছেদের, দুইটি তারকা চিহ্ন পূর্ণচ্ছেদের নির্দেশক।

॥ ০ ০ ০ ০ ॥
(গ) কল্লোলে ঃ ভরে কান্ |

॥ ০ ০ ০ ০ ॥
কণ্ঠে কাঁদিছে গান্ |

০ ॥ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ॥ ॥ ০ ॥
চিতার্ আলোকে আঁখি | রাঙায় অন্ধকার |

০ ০ ০
রাতি গো।

আটমাত্রার পর্বের ধ্বনিপ্রধান। একেবারে শেষ পর্বটি অপূর্ণ।

১। যতি কাহাকে বলে? যতির অবস্থান হইতেই বাঙ্‌লা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে। বুঝাইয়া দাও।

১৯৫৮ দেখ।

২। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের মাত্রাবিচার পদ্ধতি বুঝাও।

১৯৫৪ দেখ।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর।

(ক) চম্পক : দাম হেরি | চিত অতি : কম্পিত।

লোচনে : বহে অনু | রাগ।

তুয়া রূপ : অন্তর | জগিয়ে নি : রন্তর |

ধনি ধনি : তোহারি সো | হাগ॥

আটমাত্রার পর্বের ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত। মৌলিক অক্ষরের দীর্ঘকরণ (লো) জন্য বলা যায় প্রাচীন বা প্রত্নমাত্রাবৃত্ত।

(খ) তটিনী : পারে | অন্ধ : কারে | ক্রৌঞ্চ : সম | বুঝিরে।

এপারে : আমি | ওপারে : তুমি | ডাকিয়া : দোঁহে | খুঁজিরে।

পাঁচমাত্রার ধ্বনি প্রধান ছন্দ। শেষ পর্ব অপূর্ণ।

১। যতি ও ছেদে কোনও পার্থক্য আছে কি? অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতি ও ছেদ স্থাপনের বিধি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

"ছেদ" অর্থে ভাবসমাপ্তি বুঝায়। তজ্জন্য দাঁড়ি, সেমিকোলন, কমা প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ভাব সমাপ্তি না ঘটিলেও একটি বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরাম উহাকে যতি বলে। সংস্কৃতে বলা হয় "যতির্জিহ্বেষ্ট বিরামস্থানং" অর্থাৎ জিহ্বার অভিপ্রেত বিরামস্থান। কিন্তু ইহাতে যতি সম্বন্ধে খুব স্বল্পই বুঝা যায়। ভাষাবিজ্ঞানে যতির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা কথা বলার সময় বা গদ্যাংশ পাঠ করার সময় ঝোঁক দিয়া এক একটি শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করিয়া থাকি। এক ঝোঁকে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করার পর একটু থামি, আবার ঝোঁক দিয়া পরের কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করি। এইভাবে একটি গোটা বাক্য কয়েকটি শ্বাসবিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই শ্বাসবিভাগের মধ্যবর্তী স্থান-গুলিতে বিরাম—উহাই যতি। এই যতি ভাবসমাপ্তি নিরপেক্ষ। সাধারণ গদ্যে এইরূপ উচ্চারিত শ্বাসবিভাগগুলির মধ্যে কোনও সমতা থাকে না, অর্থাৎ সবগুলির অক্ষর সংখ্যা বা মাত্রা সংখ্যার মধ্যে কোনও একটা সামঞ্জস্যের রূপ পাওয়া যায় না, কিন্তু কবিতায় শ্বাস বিভাগ বা পর্ব বিভাগগুলির মধ্যে আছে। নিম্নলিখিত তিনটি দৃষ্টান্তে পর্ব ও যতিচিহ্ন দেখা যাইতেছে। ঐ সঙ্গে ছেদ ও যতির পার্থক্যও দেখা যাইবে।

০/০ ০ ০ ০/০ ০০ ০/

এবার আমার | ব্যথার বাঁশি | তে।

০/০০০ ০/ ০ ০০ ০/০

অশ্রুজলের | ঢেউয়ের পরে | আজি

০/০ ০০ ০/০ ০ ০ ০/

পারের তরী | থাকুক ভাসি | তে।

শ্বাসাঘাত বা শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। চতুর্মাত্রিক পর্ব। প্রতি চরণের শেষ পর্ব অপূর্ণ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ॥ ০ ০ ০ ০

(গ) দাঁড়িয়ে ঃ কেরে ও | তোর ছেলে নাকি |

॥ ০ ০ ॥ ॥

মদ্‌না ঃ না ওর | নাম ?

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ॥ ০ ০ ০

তোরি মত দেখি | জোয়ান ঃ হয়েছে |

০ ০ ০ ০ ॥ ॥

করে তো রে কাজ | কাম ?

০ ॥ ॥ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ক্ষেতের কর্মে | ভারি দড় নাকি |

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আহা ভারি খুসি | শুনে—

০ ॥ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কি বল্‌লি এই | কুড়িতে ঃ পড়িবে |

০ ০ ০ ॥ ॥ ০ ০

সামনের্ ফাল্ | গুনে !

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান ছন্দ। নিয়ত যৌগিক-দ্বিমাত্রিক। ষণ্মাত্রিক পর্ব। তিনটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অংশপর্বে চরণ। চরণান্ত মিল।

১। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী? প্রাচীনরীতির ও আধুনিক রীতির দৃষ্টান্ত—ইত্যাদি।

১৯৫৫ উত্তর দ্রষ্টব্য।

২। মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বরের পার্থক্য বুঝাইয়া বল। বিভিন্ন ঢঙের ছন্দে যৌগিক স্বরের মাত্রা গণনা কিরূপে হইয়া থাকে ইত্যাদি।

১৯৫৫ উত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর ঃ—

ο ο ο ο ο ο ο ‖ ο ο ο ο ο ο

(ক) সকালে আ ঃ সিহ গোপাল | ধেনুগণ ঃ লৈয়া | *

ο ο ο ο ο ο ο ‖ ο ο ‖ ο ο

অভাগিনী ঃ রৈল তোমার্ | চাঁদমুখ্ ঃ চাঞা | **

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

থাকিহ শ্রী ঃ দামের সঙ্গে | চরাইহ বা ঃ ছুরী | *

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

জোরে শিঙ্গা ঃ রব দিও | পরাণে না ঃ মরি | **

৮+৬ এর পয়ার ছন্দ। পুরাতন প্রকৃতির বলিয়া মধ্যে মধ্যে শব্দান্ত যৌগিক অক্ষরের সংকোচনপূর্বক একমাত্রা ধরিতে হইয়াছে। যেমন "দামের্" "চরাইহ" এখানে মের্ এবং রাই এক এক মাত্রার।

(খ) কণ্ঠে ঃ তে নীল্ | পদ্ম ঃ মালা | টিপ্‌টি নীলা | কাঁচপো ঃ কার

ধূপের্ ধোঁয়া | পাখনা ঃ তোমার্ | মুল্‌কি ঃ তুমি |

সব্‌ধোঁ ঃ কার্ ।

শ্বাসাঘাত বা শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। চতুর্মাত্রিক পর্ব। পূর্ণ চার পর্বে চরণ। চরণান্তে মিল।

(গ) এসো গো ঃ এসো | দোল্ বি ঃ লাসী |

বাণীতে ঃ মোর | দোলো |

ছন্দে ঃ মোর্ | চকিতে ঃ আসি |

মাতিয়ে ঃ তারে | তোলো ।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। যৌগিক-দ্বিমাত্রিক। পঞ্চমাত্রিক পর্ব। শেষ পর্ব অপূর্ণ।

(ঘ) সনেট—

সনেট আখ্যার গোটা কবিতাটি অবশ্যই চতুর্দশ চরণের হইবে। উহার প্রতিটি চরণ সাধারণভাবে চতুর্দশ অক্ষর এবং এক অক্ষর= একমাত্রা ধরিয়া ১৪ অক্ষর, ১৪ মাত্রার। ইহাকে প্রসারিত করিয়া ১০+৮=১৮ অক্ষরের চরণও হইতে পারে। যাই হোক এই কাব্য-রূপের প্রথম তত্ত্ব হইল ইহার চরণ সংখ্যা চতুর্দশ হইবে। দ্বিতীয় কথা, এই চতুর্দশ চরণের মধ্যে প্রথম আট চরণ এবং শেষ ছয় চরণের ভাবগত এবং মিলগত কিছু পার্থক্য থাকিবে। সনেটের প্রথম পূর্ণরূপ দাতা পেত্রার্কের মতে অষ্টকের মিলবিন্যাস হইবে কখখক, আর শেষ ছয় চরণ অর্থাৎ ষট্কের মিলবিন্যাস হইবে গঘ গঘ গঘ অথবা গঘঙ, গঘঙ, অথবা গগঘ, ঙঘঙ ইত্যাদি। ষট্কের মিলবিন্যাস অপেক্ষাকৃত মুক্ত। স্পষ্টতই বুঝা যায় এরূপ মিলবিন্যাসের সঙ্গে ভাবার্থের কিছু সঙ্গতি রহিয়াছে। গোটা চতুর্দশ-পদীটি একটি অখণ্ড ভাব লইয়া গঠিত হইলেও অষ্টকে ঐ ভাবের প্রারম্ভ ও উত্থান এবং ষট্কে ঐ ভাবের পরিণাম বা পতন লক্ষিত হয়। প্রায় পেত্রার্কার মতানুসারী একটি সনেটের নিদর্শন নিম্নে দেওয়া গেল।—

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই! ক
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব, খ
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব, খ
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই॥ ক
কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই, ক

খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎ প্রসব। খ
পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব— খ
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই॥ ক
রূপের মাঝারে চাহি অরূপ-দর্শন। গ
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ-স্পর্শন॥ গ
খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়, ঘ
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর। ঙ
বিশ্রাম পায়না মন পরের কথায়, ঘ
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-সুর॥ ঙ

ইংরেজী কবিদের মধ্যে, শেক্‌সপীয়র মিলবন্ধনের দিক হইতে একটু ভিন্ন পথে গিয়া সনেটের একটি প্রায় সার্বজনীন মিল পদ্ধতি দেখাইয়াছেন এবং তদনুসারে সনেটের নাম হইয়াছে—ইংরাজী সনেট। ইহার মিলবন্ধন এইরূপ—কখ কখ, গঘ গঘ, ঙচ ঙচ ছছ।

ইহাতে অষ্টক-ষট্‌ক স্তবক বিভাগের উপর জোর দেওয়া হয় নাই, তিনটি চারচরণের স্তবক এবং তুইটি আলাদা চরণ এইভাবে বিন্যাস করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় মূল সনেটের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির বন্ধন অব্যাহত রাখিয়া নানাভাবে মিলের বিন্যাস করা হইয়াছে।

বাঙ্‌লায় সনেটের প্রবর্তক মধুসূদন কখনও পেত্রার্কার রীতি অনুযায়ী স্তবক বিভাগ অনুসরণ করিয়াছেন কখনও করেন নাই। কখনও মিল্‌টনের কখনও শেক্‌সপীয়রের রীতিতে কখনও বা নিজস্ব পদ্ধতিতে লিখিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বরং মূল সনেটের বিভাগ অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ চতুর্দশ

পঙ্‌ক্তির মধ্যে আবার পয়ারের বা প্রবহমান পয়ারের ভিত্তিতে মিল বিন্যাস ঘটাইয়াছেন। মূল সনেটের ভাব ও মিলবিন্যাস যাহাই হোক কালে কালে ও দেশ অনুযায়ী উহার অল্পবিস্তর পরিবর্তন যে স্বাভাবিক ও ন্যায্য ইহাতে সন্দেহ কী ?

২। ছন্দোলিপি প্রস্তুত কর।

০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(ক) অবজ্ঞার : তাপে শুষ্ক | নিরানন্দ : সেই মরুভূমি |

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

রসে পূর্ণ : করি দাও | তুমি।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০

অন্তরে যে : উৎস তার | আছে : আপনারি

০ ০ ০ ০ ০

(তাই তুমি) দাও তো : উদ্ধারি |

অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের বিশিষ্টরূপ। ৬, ৮, ১০ মাত্রার রীতিতে বিচিত্রভাবে পর্ব ও চরণের বিন্যাস। চরণান্তে মিল। এইভাবে হ্রস্ব দীর্ঘ চরণ বিন্যাস রবীন্দ্র প্রবর্তিত।

০ / ০ ০ ০ ০ ০ / ০ ০ ০/০ ০ ০ ০ / ০ ০ ০

(খ) তিনটে কাছি | কাছাকাছি | যুক্ত বাঁধা | মূলাধারে।

/ ০ ০ ০ ০ ০ ০/০ ০ ০ ১ /০ ০ ০ ০ ০ /

পাঁচ ক্ষমতায় | সারথিতায় | রথ্ চালায় যুগ্ | যুগান্তরে ‖

০০/ ০ ০ ‖ / ০ ০ ০ / ০ ০ ০ /০০ ০ ০

জুড়ি ঘোড়া | দৌড়্ কুচে | দিনেতে দশ্ | কুশী মারে।

০ ০ / ০ ০ ০ / ০ ০ ০ ০ ০ /

(সে যে) সময়শির | নাড়্‌তে নারে | কলে

০ ০ ০/০ ০ ০

বিকল্ | হলে পরে ‖

শ্বাসাঘাত বা শ্বাসমাত্রিক ছন্দ। চতুর্মাত্রিক পর্ব। অক্ষরের সংখ্যা কম বেশি হইলে সংকোচন প্রসারণ নীতি রক্ষা করিতে হইয়াছে। চারপর্বে চরণ পূর্ণ।

০ ০ ‖ ০ ০ ০ ০ ‖ ০ ০ ‖

(গ) (নীল) অন্ জ ঃ ন ঘন | পুন্‌জ ঃ ছায়ায় |

‖ ০ ০ ‖ ‖ ০ ‖ ‖

সম্‌বৃ ঃ ত অম্ | বর হে গম্ | ভী

০০ ‖ ‖ ‖ ০ ০ ‖ ‖ ০০ ‖ ‖

বন লক্‌খীর | কম্পিত কায় | চন্ চল অন্ | তর

‖ ০০ ‖ ‖ ০ ০ ‖ ‖

ঝংকৃত তার | ঝিল্‌লির মন্ | জীর।

ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত। সর্বত্র যৌগিক-দ্বিমাত্রিক। চরণ বিন্যাস সংগীতের তালানুযায়ী, কবিতার দিক হইতে স্বাধীন। দ্বিতী চরণ অপূর্ণাক্ষর। ছয়মাত্রার পর্ব বলিয়া ৩+৩-এ অর্ধযতি বিভাগ।